মাসিক

সরল পথ

মানব জীবনের পথ-প্রদর্শক

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের সকলেরই রব।
সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ।"
— আল কুরআন ১৯ : ৩৬

৬ষ্ঠ বর্ষ • ৫ম সংখ্যা • মুহাররম-১৪৩৮ • অক্টোবর-২০১৭



www.masiksaralpath.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

সরল পথ

রেজিঃ নং ঃ WBBEN/2012/45211

৬ষ্ঠ বর্ষ ঃ ৫ম সংখ্যা
মুহার্‌রম-সফর ঃ ১৪৩৯ হিজরী
আশ্বিন-কার্তিক ঃ ১৪২৪ বাংলা
অক্টোবর ঃ ২০১৭ ইংরেজি

সার্বিক যোগাযোগ ঃ
সম্পাদক, মাসিক সরল পথ
উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল)
পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫
মোবাইল ঃ ৯১৫৩০৪৪১৪১

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা-১৮ টাকা, বাৎসরিক- ২০০ টাকা, বাৎসরিক সাধারণ ডাক যোগে - ২৩০ টাকা।

ডিষ্ট্রিবিউশন ম্যানেজার ঃ (ডাকযোগেও পত্রিকা পেতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন)
জিয়াউর রহমান, ৮৯২৬৭৮৭৮৯৩, ৯৮০০৫৩৪২৪৩

কম্পিউটার টাইপ সেটিং ঃ
এস.এফ. প্রিন্টার্স, মোঃ- ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪
Email Id : sfprintersbld@gmail.com

সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের পক্ষে সেখ হাবিবুল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Email Id : editorsaralpath@gmail.com
Website : www.saralpathtrust.com

<u>সূচীপত্র</u> <u>পৃষ্ঠা</u>

সম্পাদকীয়
রোহিঙ্গা ও বিশ্ববিবেক

রোহিঙ্গা! রোহিঙ্গা!! রোহিঙ্গা!!!

রোহিঙ্গা মজলুমদের গগণবিদারী আর্তনাদ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আজ পৃথিবীর সর্বত্র। ভারী হয়ে গেছে আকাশ বাতাস। কি-বা শিশুমন, কি-বা বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা ক্ষেত্র, রাজনীতি, সমাজনীতি, সাধারণ আমজনতা সর্বস্তরের আলোচনার বিষয় এই 'রোহিঙ্গা'। রোহিঙ্গা, বঞ্চনারই এক ব্র্যান্ড নেম। সম্প্রতি মায়ানমারের জাতি শুদ্ধির নামে যে রোহিঙ্গা সাফাই যা কবি নজরুলের ভাষায় 'জাতের নামে বজ্জাতি' চলছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক নির্লজ্জ, অমানবিক ও কলঙ্কজনক অধ্যায়। যদিও জাতি সাফাই (Ethnic Cleansing) বা জাতি শুদ্ধির ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম নয়। ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যাবে যে, খ্রিস্ট পূর্বাব্দ ১৪৯ সালে এ জাতি শুদ্ধির সূচনা যার ফলে সংঘটিত হয়েছিল রোমান রিপাবলিক ও আফ্রিকানদের মধ্যে তৃতীয় পিউনিখ যুদ্ধ। ফলস্বরূপ আফ্রিকার কার্থেজ শহরের প্রায় ৫০০০০ মানুষ রোমানদের কৃতদাসে পরিণত হয়েছিল। এরপর ৩৫০ খ্রিস্টাব্দে চীনে শুরু হয়েছিল জাতি সাফাইয়ের অভিযান। সেবারের হত্যালীলায় প্রাণ গিয়েছিল প্রায় দু লক্ষ বনী আদমের। পরবর্তীকালে জার্মানীতে হিটলারের নেতৃত্বে ইহুদী নিধন এবং সর্বোপরি রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পরে স্ট্যালিনের সর্বগ্রাসী একনায়কত্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহরণ বিশ্ববাসীর মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। ধ্বংসাত্মক জাতি নিধনের এসব ছিটেফোঁটা ঐতিহাসিক নমুনা। তবে নিঃসন্দেহে একবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত মানবতাবাদী ও গণতান্ত্রিক চেতনার যুগে জাতি শুদ্ধির নামে রোহিঙ্গা নিধন ইতহাসের জাতি নিধন পর্বের এক কালো অধ্যায় এবং বলা যেতে পারে জাতি নিধনের এক নির্মম আধুনিক সংস্করণ। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রায় পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত রোহিঙ্গা আজ বাঁচার তাগিদে নাফ নদী পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় প্রার্থী। অবলীলাক্রমে আরাকান প্রদেশে চলছে গণহত্যা, ছাড় পাচ্ছে না নিষ্পাপ শিশুরাও। নারী ধর্ষণ এমনকী গর্ভবতী মায়েরাও ভয়াল ধর্ষণের ছোবল থেকে পায়নি রেহাই। গণমাধ্যম ও স্যাটেলাইটের দৌলতে সে নগ্ন পৈশাচিক ছবি আজ বিশ্ববাসীর কাছে মূর্তমান। অথচ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী রাষ্ট্রনায়করা বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী মোড়লরা আজ নীরব দর্শক। বিশ্ব জনমতকে ধোঁকা দেবার জন্য জাতিপুঞ্জকে তাদের ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করছে। রোহিঙ্গারা 'মুসলিম' এটাই তাদের অপরাধ। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পশ্চিমারা আজ সন্ত্রাসবাদ ও ইসলামকে একাকার করে ফেলেছে। তাই পরিকল্পিতভাবে রোহিঙ্গা মুসলিম নিধন যজ্ঞে তারা কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে শান্তি উদ্যোগের নামে মাসের পর মাস কালক্ষেপণ করছে। চরম পীড়ন, দলন ও দমন চলছে রোহিঙ্গাদের উপর। তাই কবির ভাষায় বলি —

''অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই-প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই—
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি,
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় -
মহৎ সত্য বা রীতি কিংবা শিল্প অথবা সাধনা,
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।''

রোহিঙ্গাদের জন্য এটাই নির্মম বাস্তবতা। আজ তারা স্বজনহারা, বাস্তুহারা, কেউবা মাতাপিতৃহারা, কেউবা সন্তানহারা জনক-জননী- এ এক নিদারুণ 'সভ্যতার সংকট'। তাই সখেদে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

''জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়,
ধর্মেরে ভাসাতে চায় বলের বন্যায়।''

অথচ আজকের মায়ানমারের একচ্ছত্র অধিপতি সু-চি সেদিন নোবেল গ্রহণের লগ্নে বলেছিলেন, ''আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য গৃহহীনদের জন্য গৃহ এবং শরণার্থী, গৃহহীনমুক্ত পৃথিবী তৈরি করা।'' অথচ সু-চি পরিচালিত এমন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এর পূর্বে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেনি। শত সহস্র রোহিঙ্গা নাফ নদীর বুকে পালহীন নৌকোতে শুকিয়ে শুকিয়ে মারা যাচ্ছে, গ্রামের পর গ্রাম আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারা যখন প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে তখন তাদের উপর করা হচ্ছে গুলি বর্ষণ। মায়ের কোল থেকে সন্তান কেড়ে নিয়ে তাকে করা হচ্ছে টুকরো টুকরো। রোহিঙ্গাদের জন্য এ এক নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস। এহেন পরিস্থিতিতেও প্রতিবেশী রাষ্ট্র তথা বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রনায়করা তাদের প্রতি এখনও উদাসীন, নির্লিপ্ত, অনুদার ও অ-সহযোগী। বেঁচে থাকার জন্য নেই তাদের প্রয়োজনীয় অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান। তাই কবিগুরুর ভাষায় বিশ্ববিবেকের উদ্দেশে আহ্বান—

''এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা;
এই - সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা;
ডাকিয়া বলিতে হবে —
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনই জাগিবে তুমি তখনই সে পলাইবে ধেয়ে
....
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।'' (এ বার ফিরাও মোরে)

পরিশেষে কুরআনুল কারীমের ভাষায় সমগ্র বিশ্ব মানবের কাছে আমাদের এ জিজ্ঞাসা ''তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য সংগ্রাম করবে না? যারা বলছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! অত্যাচারী অধিবাসীদের এ নগর হতে আমাদের বের করে অন্যত্র নিয়ে যাও এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক করো এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সহায় নিযুক্ত করো'।'' (সূরা নিসা ৭৫)

— আবু ফাইসাল সালমান

s ‘

দারসে ক্বুরআন (ক্বুরআনের পাঠ)

আসুন স্বলাতে আগ্রহী ও স্থির হই

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ o فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ o

সমস্ত স্বলাতের হিফাযত কর, বিশেষতঃ স্বলাতে উস্ত্বা-র (মধ্য স্বলাতের) এবং (শুধুমাত্র) মহান আল্লাহ্র জন্য অনুগত অবস্থায় কিয়াম কর। যদি (কোনো কিছু ক্ষতির) আশংকা বোধ কর, তাহলে চলমান অবস্থায় (স্বলাত প্রতিষ্ঠিত কর) তা যদি বাহনের উপরেও হয়। যখন নিরাপদ হবে তখন তোমরা আল্লাহ্কে অনুরূপ স্মরণ কর যেমনটি তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন যা তোমরা জানতে না (সূরাতুল বাক্বারাহ্ ২৩৮-২৩৯)।

মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক সাবালক নর ও নারীর জন্য প্রত্যহ পাঁচবার স্বলাত প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক করেছেন। তিনি তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ও নির্দ্ধারণ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন —

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا.

নিশ্চয় স্বলাহ্ বিশ্বাসীদের (মুমিনদের) উপর নির্দ্ধারিত সময়ে ফরয।

সময়ে স্বলাত আদায় না করা ও তা প্রতিষ্ঠা করতে অলসতা প্রকাশ করাকে কপট বা মুনাফিক ব্যক্তির বিশেষত্ব বলে আল্ কুরআন তথা সহীহ্ হাদীস সমূহে উল্লেখিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ বলেন —

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ اِذَا قَامُوْآ اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا.

নিশ্চয় মুনাফিকবৃন্দ আল্লাহ্র সাথে ধোকাবাজি করে, তিনিও তাদের ধোঁকার অনুরূপ বিনিময় প্রদান করবেন। যখন তারা স্বলাতের জন্য গমন করে তখন তারা তা অলসতার সাথে করে। এরা যৎকিঞ্চিত আল্লাহ্কে স্মরণ করে (সূরাতুন নিসা ১৪২)।

অন্যত্র বলেন —

وَ لَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَ هُمْ كُسَالٰى وَ لَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَ هُمْ كٰرِهُوْنَ.

তারা অলসতার সাথে স্বলাতে উপস্থিত হয় এবং তারা অনিচ্ছা সহকারে দান করে থাকে (সূরাহ্ তাওবাহ্ ৫৪)।

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا اصْفَرَّتْ وَ كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطٰنِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, এটি মুনাফিকের স্বলাতের মত স্বলাত যে ব্যক্তি বসে বসে সূর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে, যখন সূর্যটা হলুদাবরণ ধারণ করে সে সময় সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখানে থাকে, তখন সে দাঁড়ায় ও চারটি ঠোঁকর মারে। সে অতি অল্পই আল্লাহ্কে স্মরণ করে (সহীহ্ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ্ ৫৯৩)।

আলোচ্য হাদীসে একটি উপমা বিবৃত হয়েছে মাত্র। যারা চায়ের দোকানে, মোড়ে, ক্লাবে, ব্যবসা কেন্দ্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বত্রই স্বলাত আদায় করার জন্য ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং চূড়ান্ত মুহূর্তে শুধুমাত্র নাম নথিভুক্ত করার মানসে কোনো এক পর্যায়ে মসজিদে উপস্থিত হয়, অথবা স্বলাত আদায় করার জন্য চরম মুহূর্তের দিকে তাকিয়ে পার্থিব লালসাকে চরিতার্থ করে থাকে, তাদের জন্যই উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস সমূহ। জামাআতের উদ্দেশ্যে আযানের জন্য লাউড স্পীকারের ব্যবহার, সময় সূচী জ্ঞাপক বোর্ড এবং মুসল্লীদের জন্য যাবতীয় আয়োজন সত্বেও উল্লেখযোগ্য মানুষের রাকাআত সমূহের ছুটে যাওয়া ও সালাম পরবর্তী সময়ে আসামীর মত দাঁড়িয়ে যাওয়াটা এবং একই মসজিদে ধারাবাহিক ভাবে একাধিক জামাআত হওয়ার অনেক কারণের অন্যতম কারণ হল অলসতা ও ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে চূড়ান্ত মুহূর্তে মসজিদ অভিমুখে যাত্রা করা। বাড়িতে

মহিলাগণও একই ব্যাধিতে আক্রান্ত। খুব কম পরিবারের মহিলাগণ সঠিক সময়ে স্বলাত আদায় করেন। বিলম্বে রান্না শুরু, প্রয়োজনের তুলনায় ভ্যারাইটিজ্ রন্ধন ইত্যাদির কারণে মানব জন্মের মূল লক্ষ্য ইবাদাত উপেক্ষিত এবং উপলক্ষ্যে ত্রস্ত্র-ব্যস্ত। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন, স্বলাতের হিফাযত করতে। সুরক্ষা প্রদানের নীতিমালার মধ্যে প্রাক্ প্রস্তুতি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরীক্ষার হলে, ট্রেনের জন্য স্টেশনে, বিমানের জন্য এয়ারপোর্টে, চিকিৎসার জন্য ডাক্তারখানায় সময়ের পূর্বেই পৌঁছায়। আশংকা একটাই হাতছাড়া না হয়। কিন্তু স্বলাত, যা ত্যাগ করলে ইসলাম ও ঈমান হারানোর চরম আশংকা সেখানে বিলম্বে অংশ গ্রহণ করাটাই হচ্ছে ট্র্যাডিশন। মাদ্রাসা ও মসজিদে অবস্থানরত ছাত্র ও শিক্ষকদের রাকাআত ও জামাআত ছুটে যাওয়াটাই এখন স্বাভাবিক ঘটনা। কী বলবেন এমন ব্যক্তিদের যারা স্বভাবনা ও স্বঘোষণাতে দ্বীনদার। কিন্তু স্বলাতের বিষয়ে যেখানে অলসতা মানুষকে মুনাফিকের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয় সেখানে এ অবস্থা কেন? আসুন বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ বিষয়ে কী বলেন তা আমরা একটু অবগত হই।

তিনি বলেন, ''যে ব্যক্তির ইচ্ছা আছে যে সে আগামীকাল (মৃত্যুর পর) মুসলিম হিসাবে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে, তার উচিৎ স্বলাতসমূহকে সঠিকভাবে ওই স্থানে গিয়ে আদায় করা যেখানে স্বলাতের জন্য আযান দেওয়া হয় (অর্থাৎ মসজিদে)। কেননা মহান আল্লাহ্ তোমাদের নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপর হিদায়াতের জন্য বেশ কিছু নিয়মনীতি নির্ধারণ করেছেন। পাঁচ ওয়াক্তের স্বলাতও ঐ নীতি সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা সেগুলিকে তোমাদের বাসগৃহে পিছনে থাকা 'মুনাফিকদের' ন্যায় পড়, তাহলে তোমরা তোমাদের নাবীর সুন্নাহ্ ত্যাগকারী হয়ে যাবে। আর নাবীর সুন্নাহ্ ত্যাগ করলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

''কোনো ব্যক্তি যদি উত্তমরূপে অযু করে যে কোনো মসজিদ অভিমুখে যাত্রা করে, তাহলে তার প্রতিটি পদক্ষেপে মহান আল্লাহ্ একটি করে নেকী লিখেন, একটি সম্মান বৃদ্ধি করেন ও একটি পাপ মোচন করেন। আমরা লক্ষ্য করেছি স্বলাত হতে একমাত্র চিহ্নিত মুনাফিক ব্যতীত কেউ পেছনে থাকতো না। অসুস্থ ব্যক্তিকেউ দুজন ব্যক্তির মধ্যে রেখে ধরাধরি করে এনে লাইনে দাঁড় করানো হতো'' (সহীহ্ মুসলিম ৬৫৪)।

হাদীসটিকে প্রতিটি মুসল্লীর বার বার পড়া উচিৎ। অতঃপর নিজেদের দুর্বলতার মূল্যায়ণ করা বাঞ্ছনীয়। ব্যবসা, চাকুরী, শিক্ষকতা, চাষাবাদ ও অধ্যায়ণ ইত্যাদি বাহানাতে স্বলাতের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত, বর্তমানে গৌণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এতে যে আমাদের ব্যস্ততা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। পছন্দের ও সময়ের খাদ্যটাও সঠিক সময়ে ও সঠিক আসনে খাওয়ার সুযোগটাও আল্লাহ্ আমাদের কেড়ে নিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَـا ابنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِى أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًا وَ اَسُدَّ فَقْرَكَ
وَ اِلَّا تَفْعَلْ مَلأْتُ يَدَكَ شُغْلاً وَّ لَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ.

অর্থ ঃ হে আদম সন্তান! আমার ইবাদাতের জন্য সময় বের কর। তোমার হৃদয়কে ধনী করে দিব এবং তোমাকে অভাব মুক্ত করব। যদি তুমি তা না কর তাহলে তোমাকে কর্মব্যস্ত করে দিব এবং তোমার অভাব মোচনও করব না (হাদীস সহীহ্, সুনানু-বনু মাজাহ্ ৪০১৭, সুনানুত্ তিরমিযী ২৪৬৬)।

মসজিদে শেষ মুহূর্তে গমন ও সংক্ষিপ্ত স্বলাত শেষে দ্রুত প্রস্থান ঈমানের দুর্বলতার পরিচয়।

তিরমিযীর এক লম্বা হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত শেষে দীর্ঘক্ষণ যিক্র আযকারে নিমগ্ন থাকলে পাপ মোচন হয়। এক স্বলাত শেষে অন্য স্বলাতের জন্য ব্যাকুল থাকলে মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। স্বলাত নিয়মিতভাবে সহীহ্ সুন্নাহ্ অনুযায়ী আদায় করলে সুস্থ জীবন ও স্বাভাবিক মৃত্যু নসীব হয় (হাদীস নম্বর ৩২৩৪)।

সহীহুল বুখারীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ফেরেশতা ওই মুসল্লীর উপর রহমত বর্ষণের জন্য দুআ করতে থাকে। যে স্বলাত আদায় করার পর উক্ত স্থানে বসে যিক্র করতে থাকে, যতক্ষণ না তার অযু নষ্ট হয়। তাঁরা বলেন, হে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ্ তার প্রতি দয়াবান হও (সহীহুল বুখারী ৪৪৫)।

সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে স্বলাত শেষে দ্রুত প্রস্থান না করে, যিকরে যুক্ত থাকাতে প্রভূত কল্যাণ অনিবার্য।

স্মর্তব্য যে, মহান আল্লাহ্‌র সম্পদ ও সম্মান প্রদানের ইচ্ছা না থাকলে তা অর্জন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ আমাদের ক্ষমা করুন ও যা মঙ্গলদায়ক তাতে যুক্ত থাকার শক্তি দান করুন — আমীন।

দারসে হাদীস (হাদীসের পাঠ)

ভালো মানুষ

আতাউর রহমান সালাফী

عَـنُ عَائِشَةَ رَضِىُ اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُوُلُ اللّٰهِ ﷺ

” خَيـرُكُـمُ خَيـرُكُـمُ لِأَهُـلِـهِ وَ اَنَا خَيرُكُمُ لِأَهُلِىُ وَ اِذَا

مَاتَ صَاحِبُكُمُ فَدَعُوُهُ“.

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ‘‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে নিজ পরিবারের নিকট উত্তম। আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের মধ্যে উত্তম। তোমাদের কোনো সাথী মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও’’ (তিরমিযী, বাবুন ফী ফাযলি আযওয়াজিন্নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম - নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের স্ত্রীদের ফাযীলাত, হাঃ নং ৩৮৯৫, হাদীস সহীহ্)।

নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর এ হাদীস দ্বারা উম্মাতে মুহাম্মাদী দুটি নীতি উপহার হিসাবে অর্জন করেছে — (১) ভালো হওয়ার নীতি, (২) মৃত ব্যক্তির দোষ ত্রুটি বর্ণনা না করার নীতি।

(১) ভালো হওয়ার নীতি ঃ মহান আল্লাহ্ মানুষকে শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন। এহেন সৃষ্টি সেরা, শ্রেষ্ঠত্ব যাতে টিকিয়ে রাখতে পারে তার জন্য দিয়েছেন বহু নিদানও। এ হাদীসের প্রথমাংশে নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর উম্মাতকে অর্থবহ এক ছোট্ট বাক্য দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বের গুণ সম্বলিত এক নীতি দিয়েছেন উপহার। তিনি বলেন, ‘‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তাঁর পরিবারের নিকট উত্তম।’’ অতঃপর তিনি এ বিষয়ে এক আদর্শ ব্যক্তির উল্লেখ করেন। সে আদর্শ ব্যক্তি হলেন নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বয়ং। তিনি বলেন, ‘‘আমি স্বীয় পরিবারের নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।’’

নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর এ নীতি দ্বারা আমরা যে শিক্ষা পাই তা হল—মানুষ যদি তার পরিবারের নিকট উত্তম হতে পারে তবে সে উত্তম। একজন মানুষ সব থেকে বেশি সময়, সব থেকে বেশি সংখ্যক কাজে, সব থেকে বেশি খোলামেলা ও স্বাধীনভাবে অবস্থান করে নিজ পরিবারে। যদি এমন ব্যক্তি পরিবারের প্রধান হয় তবে কর্তা হওয়ার সুবাদে আচরণ প্রকাশেও কর্তা। ফলে একজন ব্যক্তির আচরণ, ব্যবহার ও অন্যান্য গুণাবলী সব থেকে বেশি প্রকাশ পায় এখানে। এ বলয়ে যদি কেউ নিজেকে উত্তম রূপে তুলে ধরতে সক্ষম হয়, তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে ব্যক্তি অন্যত্রও ভালো মানুষ হিসাবে বিবেচিত হবে। যখন কোনো ব্যক্তি ঘরে ও বাইরে ভালো মানুষ হিসাবে পরিচিত হবে, তখন নিঃসন্দেহে সে আল্লাহ্র নিকটেও ভালো মানুষ হিসাবে স্বীকৃত হতে পারবে।

যে বলয়ে ভালো হতে পারলে ভালো মানুষ হওয়া যাবে বলে নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উল্লেখ করেছেন সে বলয় হল আহ্ল। আহ্ল শব্দের অর্থ হল পরিবার। এর মধ্যে শামিল রয়েছে - স্ত্রী, সন্তানাদি, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এমনকী বন্ধুবান্ধবও।

পরিবারের নিকট ভালো মানুষ হওয়ার দুটি দিক। (এক) পরিবারের সদস্যদের পার্থিব চাহিদা যথাযথ পূরণে উদারহস্ত এবং নম্র ভদ্র আচরণের মাধ্যমে ভালো মানুষ। (দুই) পরকালীন স্থায়ী জগতে সফলতা অর্জনে সহায়ক বিষয়াদি সরবরাহের মাধ্যমে ভালো মানুষ। পার্থিব জগতের চাহিদা পূরণে উদারহস্ত ও সুচারু আচরণের মাধ্যমে ভালো মানুষ অসংখ্য পাওয়া যাবে। কিন্তু পরকালীন সফলতা অর্জনে সহায়ক বিষয়াদি সরবরাহের মাধ্যমে ভালো মানুষ নেহাতই কম। পার্থিব চাহিদা পূরণে উদারহস্ত হলেই পরিবারের সদস্যরা তাকে ভালো মানুষ বলে মনে করে। আচরণ খারাপ হলেও হজম করে নেয়। পার্থিব চাহিদা পূরণে মিতব্যয়ী, অক্ষম বা কৃপণ ব্যক্তির সাথেই পরিবারের অন্য সদস্যদের বাগবিতণ্ডা লক্ষ্য করা যায়। দেখতে পাওয়া যায় এ কারণেই যত সাংসারিক অশান্তি। কিন্তু এ চাহিদা পূরণ ও উদারতা মূল্যহীন না হলেও এ রকম ভালো মানুষ হওয়ার পরিণতি সাময়িক। যদি এর সাথে সাথে পরকালীন সফলতার বিষয়াদি সরবরাহ না করা হয়, তবে এ রকম ভালো মানুষ আল্লাহ্র দরবারে একেবারে মূল্যহীন। প্রকৃত ভালো মানুষ হতে গেলে পার্থিব বিষয়াদিতে ভালো বিশেষণ অর্জন করতে না পারলেও পরিবারকে পরকালে সফল হওয়ার বিষয়াদি সরবরাহ করতে হবে।

নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বীয় পরিবারের নিকট সাহাবাদের মধ্যে সব থেকে ভালো মানুষ বলে নিজেকেই আদর্শ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অথচ তাঁর সংসারে ছিল চরম অস্বচ্ছলতা। পার্থিব চাহিদা পূরণ ভালো হওয়ার মানদণ্ড হলে নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কখনোই আদর্শ তো দূরের কথা সাধারণ ভালো মানুষও হতে পারতেন না। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘‘মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কখনো ময়দার নরম রুটি খেয়েছেন আমার জানা নেই এবং তিনি

কখনো স্বচক্ষে ছাগলের ভুনা গোস্ত দেখেছেন সে কথাও আমার জানা নেই'' (বুখারী ঃ অধ্যায় নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জীবন যাত্রা কেমন ছিল, হাঃ নং ৬৪৫৭)। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বর্ণনায় পাওয়া যায় ''দুই মাস অতিবাহিত হয়ে তৃতীয় মাসের চাঁদ দেখা যেত অথচ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর গৃহে আগুন জ্বলত না। এ সময় তাঁরা দুই কালো বস্তু খেজুর ও পানি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন'' (প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৪৫৯)।

অভাবের কারণেই নাবী পত্নীদের পার্থিব চাহিদা পূরণ না হওয়ায় এক সময় নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্ত্রীদের আচরণে মনক্ষুণ্ণ হন। এক মাস যাবৎ স্ত্রীদের থেকে দূরে অবস্থান করেন। অতঃপর সূরা আহযাবের ২৮-২৯ নং আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে সমাধা হয়।

তাঁর প্রথমা স্ত্রী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মারা যাওয়ার পর ১০ জন মহিলাকে বিবাহ করেন ও একই সঙ্গে স্ত্রী হিসাবে আয়ত্বে রাখেন। এর পরেও আরও দুজন দাসী ছিল।

উপরে বর্ণিত অভাব সত্বেও দশ জন স্ত্রী ও দুজন দাসী একসঙ্গে রেখে নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পরিবারের নিকট ভালো মানুষ হিসাবে আদর্শ। এ থেকে স্পষ্ট যে, তিনি যে কারণে আদর্শ তা হল উত্তম আচরণ প্রকাশ ও পরকালীন সফলতার বিষয়াদি উপস্থাপনে ছিলেন প্রাণপুরুষ।

নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে পরিবারের নিকট উত্তম হতে গেলে আমাদের যা করণীয় তা হল-নম্র-ভদ্র ব্যবহারের অধিকারী হতে হবে। সাথে সাথে আয়ত্বাধীন সদস্যদের পরকালীন সফলতার বিষয়কেই মূল দায়িত্ব ধরে বাস্তবায়ণে সক্রিয় হতে হবে। কেননা দ্বীনের শিক্ষা দান এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি ও জান্নাত প্রাপ্তির আমল নিজে বাস্তবায়ণ ও সদস্যদের সরবারহ করণই হলো সর্বোত্তম আচরণ।

আল্লাহ্ বলেন, ''হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও পরিবারকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করো (৬৬/৬)। তোমরা শীঘ্র ধাবিত হও তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে (৩/১৩৩)।''

আমরা সকলেই পরিবারের সদস্যদের পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দের সরঞ্জাম সরবরাহে সদা ব্যস্ত। এ কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদনের জন্য সফল গার্জেন। পরিবারে তো বটেই আর পাঁচজন গার্জেনের নিকট থেকেও সুনাম প্রাপ্ত। কিন্তু এ রমক সফলতা ও সুনাম আল্লাহ্র নিকট উত্তম মানুষ খেতাব পেতে সহায়ক নয়।

সাধারণ মানুষ তো বটেই বহু আলেম, বক্তা, মুবাল্লিগ দশ ও দেশ নিয়েই ব্যস্ত। জনগণের কল্যাণ নিয়ে যত মাথা ব্যথা। যত সময় ব্যয় হয় পরিবারের বাইরের লোকদের জন্য। সময় নেই বাড়িকে ঠিক করার, সুযোগ নেই পরিবারের সদস্যদের কুরআন শেখানোর, ফুরসাত নেই তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''মানুষ তার পরিবারের রক্ষাকারী, তাকে তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে'' (বুখারী ৮৯৩)। কিয়ামাতের দিনের এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আমাদের নিকট রয়েছে কিনা আমরা ভেবে দেখবো কবে? আমাদের কবে সময় হবে এ প্রশ্নেরও উত্তর সন্ধানের — ''আমাদের সদস্যরা কি সত্যিই কিয়ামাত দিনেও আমাদেরকে সফল ও উত্তম গার্জেন বলে স্বীকৃতি দিবে?'' যদি উত্তর 'না' হয় তবে আসুন প্রকৃত ভালো মানুষ হওয়ার আসল গুণাবলি সন্ধান করে তার বাস্তবায়ণে আজই নিয়োজিত হই।

(২) মৃত ব্যক্তির দোষ ত্রুটি বর্ণনা না করার নীতি ঃ হাদীসের দ্বিতীয় অংশে যে নীতি উম্মাতে মুসলিমাহ্কে উপহার দেওয়া হয়েছে তা হল — 'মৃত ব্যক্তির দোষ ত্রুটি বর্ণনা না করার নীতি।'

একজন মুমিন শুধু জীবিত মানুষের সাথে সদাচরণ করবে তাই নয়, মৃত মানুষের সাথেও সদাচরণ তার কার্তব্য। নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মৃত ব্যক্তির সাথে করণীয় বহু আচরণ নীতিও দিয়েছেন উপহার।

অত্র হাদীসে যে নীতি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন তা হল, ''আমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার দোষ ত্রুটি জনিত কথা যেন আমরা আলোচনা না করি। চির বিদায় নিয়ে আল্লাহ্র পথে পাড়ি দেওয়া বন্ধুর দোষ ত্রুটি আলোচনা করে কোনোই লাভ নেই। বরং আপন ভাইয়ের দোষ ত্রুটি বর্ণনা করে গীবত করাকে মহান আল্লাহ্ 'মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ' বলে তা হতে দূরে থাকার জন্য কড়া সতর্ক করেছেন (৪৯/১২)। কাজেই আমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে পরিবারের অন্য সদস্য বা সাধারণ বন্ধু সকলেই তার সকল প্রকার দোষ ত্রুটি বর্ণনা হতে বিরত থাকবে। হ্যাঁ যদি এমন কোনো ত্রুটি থাকে যার ফলে তার মৃত্যুর পরও উম্মাত সমস্যাগ্রস্ত হবে বলে মনে হয়, তবে তা বর্ণনা করা যাবে। যেমন কোনো লেখকের কোনো ভুল লিখা বা কোনো ভুল ফাতাওয়া কিংবা কোনো ব্যক্তির ভুল আচরণ, যাকে অন্য কেউ আদর্শ মনে করবে বলে সম্ভাবনা রয়েছে। এ রকম ত্রুটি মৃত্যুর পরে উম্মাতকে তা হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে আলোচনা বৈধ। যেমনটি হাদীসের বর্ণনাকারীদের দোষ ত্রুটি বর্ণনা জায়েয।

আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা, হে আল্লাহ্! আমাদের ভালো মানুষ হওয়ার তাওফীক দাও এবং নিজ ভাইয়ের অযথা দোষ ত্রুটি বর্ণনা হতে রক্ষা করো — আমীন।

৩৪ পর্ব

بَابُ الْحَيْضِ ❶ وَ النِّفَاسِ

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

নেফাসের মাসায়েল

নেফাসের সর্বোচ্চ মীয়াদ হল ৪০ দিন ❶	وَ النِّفَاسُ اَكْثَرُهُ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا .

❶ (ক) উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে,

নেফাসওয়ালী মহিলারা আল্লাহ্‌র রসূলের যুগে চল্লিশ দিন ইদ্দত পালন করতেন।[১]

(খ) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে,

আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নেফাসওয়ালী মহিলাদের জন্য চল্লিশ দিনের মীয়াদ নির্ধারণ করেছিলেন। তবে এর পূর্বে পবিত্রতা হাসিল হলে, তা স্বতন্ত্র বিষয়।[২]

(জমহুর) ঃ নেফাসের সর্বোচ্চ মীয়াদ হল চল্লিশ দিন। আলী, উসমান, উমার, আয়েশা, উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), ইমাম আতা, ইমাম সওরী, ইমাম শাআবী, ইমাম মুযনী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) সকলের এটাই মত।

(শাফেয়ী রহঃ) - মীয়াদ ৬০ দিন। অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালেকেরও এটাই মত।

(হাসান বাসারী) - মীয়াদ ৫০ দিন।

তাছাড়া কেউ কেউ বলেছেন - মীয়াদ হল ৭০ দিন।[৩]

(নওয়াবী রহঃ) - সাহাবা, তাবেঈন এবং তাঁদের পরবর্তীদের মধ্যে অধিকাংশ ওলামাদের নিকটে নেফাসের সর্বোচ্চ মীয়াদ হল ৪০ দিন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম খাত্তাবী প্রমুখরাও একথা বেশি বেশি বর্ণনা করেছেন। ইমাম খাত্তাবী বর্ণনা করেছেন যে,

---

১। হাসান ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৩০৪, কিতাবুত ত্বাহারাত ঃ বাবু মা জাআ ফী ওয়াকতিন নুফাসা, আহমাদ ৬/৩০০-৩০৪, তিরমিযী ১৩৯, ইবনু মাজাহ্ ৬৪৮, দারাকুতনী ১/২২১-২২২, হাকিম ১/১৭৫, বাইহাকী ১/১৪৩।

২। যঈফ ঃ যঈফ ইবনু মাজাহ্ ১৩৮, কিতাবুত তাহারাত অ সুনানেহা ঃ বাবু মা জাআ ফিন নুফাসা কাম তাজলিসু, ইরওয়ালুল গালীল ২০১, আয্ যঈফা ৫৬৫৩, আব্দুর রায্যাক ১/৩১২, দারাকুতনী ১/২২০, বাইহাকী ১/৩৪৩, হাফিয বুয়াইসেরী (রহঃ) যাওয়ায়েদে এই হাদীসের সনদকে সহীহ্ বলেছেন ১/২৩২।

৩। আল মাজমূ ২/৫৩৯, আল মুগনী ১/৩৪৫, আল মুহাল্লাহ্ ২/২০৩, আল ইফসাহ্ ১/১০৮, বাদায়েউস সানায়ে ১/৪১, মারাকাল ফালাহ্ পৃঃ ২৩, মুগনিল মুহতাজ ১/১১৯, হাশিয়াতুল বাজুরী ১/১১৩, আল্ মুহায্যাব ১/৪৫, কাশ্শাফুল কানা ১/২২৬।

ইমাম আবূ উবাইদা বলেছেন যে, ''এর উপরেই মানুষের সহমত রয়েছে।'' ইমাম মুনযির (রহঃ) উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), উসমান বিন আবীল আস, আয়েয বিন আমর, উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইমাম সওরী, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম ইবনু মুবারক, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক এবং ইমাম আবূ উবাইদা (রহঃ) থেকে এ কথাই বর্ণনা করেছেন।[১]

(যায়েদ বিন আলী রহঃ) - চল্লিশ দিনের বেশি নেফাস থাকে না।[২]

(সিদ্দিক হাসান খাঁ) - এ কথাই সঠিক।[৩]

(শওকানী রহঃ) - নেফাসওয়ালী মহিলাদের চল্লিশ দিন ইদ্দত অতিবাহিত করা ওয়াজেব।[৪]

(আঃ রহমান মুবারকপুরী) - একথাই বলেছেন।[৫]

(তিরমিযী রহঃ) - সাহাবা, তাবেয়ীন এবং তাঁদের পরবর্তী বিদ্বানদের এ বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে।[৬]

রাজেহ ঃ এ মতামতটিই বেশি সঠিক এবং যথার্থ।

৯৯। চল্লিশ দিনের পরেও যদি রক্ত প্রবাহিত হয় ?

ইমাম তিরমিযী বলেন, ''অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন যে, চল্লিশ দিনের পর স্বলাত পরিত্যাগ করবে না''।[৭]

(শাইখ আব্দুর রহমান নাসের সাআদী রহঃ) - চল্লিশ দিনের পরে যদি রক্ত আসে, তাহলে সেই রক্তকে নেফাসের রক্ত হিসাবেই গণ্য করতে হবে।[৮]

(শাইখ উসাইমীন রহঃ) - যদি কোনো মহিলার আগে থেকেই চল্লিশ দিনের বেশি রক্ত প্রবাহিত হওয়ার অভ্যাস থাকে, তাহলে সে অভ্যাস অনুযায়ীই আমল করবে। আর যদি এরকম না হয় তাহলে ওলামাদের মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, গোসল করে স্বলাত, সওম ও অন্যান্য ইবাদাতগুলি করবে এবং সে মুস্তাহাযার অন্তর্ভুক্ত হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সে ৬০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, অতঃপর মুস্তাহাযার অন্তর্ভুক্ত হবে।[৯]

(শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম আল্ শাইখ) - যদি আগে থেকেই চল্লিশ দিনের বেশি রক্ত আসার অভ্যাস থাকে, তাহলে সেই মোতাবেক আমল করবে। অন্যথায় গোসল করে স্বলাত, সিয়াম ইত্যাদি ইবাদাত পালন করবে।[১০]

রাজেহ ঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম এর উক্তিটিই বেশি সঠিক মনে হচ্ছে। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

এর সর্বাপেক্ষা কম কোনো মীয়াদ নেই ❶ এবং এটি আহকাম ও মাসায়েলের দিক দিয়ে হায়েযের মতই ❷	**وَ لَاحَدَّ لِاَقَلِّهٖ وَ هُوَ كَالْحَيْضِ.**

❶ অধিকাংশ মাসায়েলের মত এ মসলাতেও ফকীহদের মতপার্থক্য রয়েছে ঃ

১। আল মাজমূ ২/৫২৪।
২। আর্‌রাওযুন নাযীর ১/৫১৩।
৩। আর রাওযাতুন নাদিয়্যাহ ১/১৯১।
৪। নাইলুল আওতার ১/৪১৪।
৫। তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী ১/৪৫২।
৬। তিরমিযী বাদাল হাদীস /১৩৯, কিতাবুত তাহারাত ঃ বাবু মা জাআ ফী কাম তামকুসুন নুফাসা।
৭। তিরমিযী বাদাল হাদীস ১৩৯, কিতাবুত তাহারাত ঃ বাবু মা জাআ ফী কাম তামকুসুন নুফাসা।
৮। ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমা ১/৩০০।
৯। ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমা ১/৩০৩।
১০। ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমা ১/২৯৭।

(শাফেয়ী, আহমাদ রহঃ) - নেফাসের সর্বনিম্ন কোনোও মীয়াদ নেই।

(আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ রহঃ) - নেফাসের সর্বনিম্ন মীয়াদ হল ১১ দিন।

(সওরী রহঃ)- এর মীয়াদ ৩ দিন।

(যায়েদ বিন আলী রহঃ) - এর মীয়াদ ১৫ দিন।

(ইবনু কুদামা হাম্বেলী রহঃ) - নেফাসের কোনও নির্দিষ্ট মীয়াদ নেই। যখনই পবিত্রতা অনুভব করবে, তখনই গোসল করে পবিত্র হয়ে যাবে।[১]

রাজেহ ঃ প্রথম মতটি রাজেহ। কেননা সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), তাবেঈন এবং পরবর্তী যুগের আলেমদের ঐক্যমত রয়েছে যে, নেফাসওয়ালী মহিলারা চল্লিশ দিন স্বলাত ছেড়ে দেবে। তবে যদি তার পূর্বে পবিত্রতা অনুভব করে, তাহলে গোসল করে স্বলাত পড়বে।[২]

একটি হাদীসে রয়েছে — **اِلَّا اَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذٰلِكَ.**

অর্থাৎ তবে যদি নেফাসওয়ালী মহিলা ৪০ দিনের পূর্বে পবিত্রতা দেখতে পায়, তাহলে স্বতন্ত্র বিষয়। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নেফাসের সর্বনিম্ন কোনো মীয়াদ নেই।

২ উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে,

كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ تَقْعُدُ فِى النِّفَاسِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لَا يَاْمُرُهَا النَّبِىُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ.

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর স্ত্রীদের মধ্যে কোনো কোনো স্ত্রী নেফাসের জন্য ৪০ রাত (স্বলাত ছেড়ে) বসে থাকতেন কিন্তু তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে নেফাসের অবস্থায় পরিত্যক্ত স্বলাত কাযা করার নির্দেশ দিতেন না।[৩]

ওলামাদের এ মসলাতে ঐক্যমত রয়েছে যে, নেফাস হারাম-হালাল অথবা মাকরূহ ও মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়ে হায়েযের মতই।[৪]

(সিদ্দিক হাসান খাঁ রহঃ) - সহবাস হারাম হওয়া এবং স্বলাত-সিয়াম ছেড়ে দেওয়ায় নেফাস হায়েযের মতই এবং এতে কোনো মতপার্থক্য নেই।[৫]

(শওকানী রহঃ) - এ কথাই সঠিক।

(ইবনু কুদামা হাম্বেলী রহঃ) - ঋতুবতী মহিলার মতই নেফাসওয়ালী মহিলার হুকুম ঐ সমস্ত বিষয়ে যা ঋতুবতী মহিলার জন্য হারাম বা তার উপর থেকে মকুব হয়ে গেছে এবং এ মসলাতে কোনো মতপার্থক্য আমাদের জানা নেই। একই হুকুমের কারণ হল এই যে, নেফাসের রক্ত আসলে হায়েযেরই রক্ত। গর্ভবতী অবস্থায় হায়েযের রক্ত ভ্রূণের খাবারে পরিণত হয়, তাই গর্ভবতী অবস্থায় হায়েযের রক্ত প্রবাহিত হয় না। যখন সন্তান প্রসব হয়ে যায় তখন পুনরায় রক্ত প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়ে যায়।[৬]

১। আল উম্মা ১/৬৪, আল্ মাজমূ ১/২২৮, আল মুগনী ১/২২৫, আল্ আসল ১/৪৮৫।

২। নাইলুল আওতার ১/৪১৪-৪১৫।

৩। হাসান ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৩০৫, কিতাবুত তাহারাত ঃ বাবু মা জাআ ফী ওয়াক্তনি নুফাসা, আবূ দাউদ ৩১২, হাকিম ১/১৭৪৫, বাইহাকী ১/৩৪১, দারাকুতনী ১/২২৩।

৪। নাইলুল আওতার ১/৪১৫, আল্ মাজমূ ২/৫২০।

৫। আর্ রাওযাতুন নাদিয়্যাহ ১/১৯২।

৬। আল্ মুগনী ১/৪৩২।

১ম পর্ব

فضل الصحابة و مكانتهم فى الأمة

সাহাবীগণের মর্যাদা ও মুসলিম উম্মাহ্‌র মাঝে তাঁদের অবস্থান

আব্দুল্লাহ্‌ সালাফী

(গত ১৬-১৮ই সেপ্টেম্বর জামিয়াতুল ইমাম বুখারী, কিশানগঞ্জ মাদ্রাসায় নাবী পরিবার ও সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দের বিষয়ে কাসীম বিশ্ববিদ্যালয় (মাক্কার) উদ্যোগে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেই কনফারেন্সে 'সাহাবীগণের মর্যাদা ও মুসলিম উম্মাহ্‌র মাঝে তাঁদের অবস্থান' — প্রবন্ধটি লিখিতভাবে পেশ করা হয়।)

الحمد لله رب العالمين الذى هدانا الى طريق مستقيم ليس فيه غلو و لا سقيم لأنه دين عظيم ، نزل على نبينا محمد من رب كريم ﷺ لان لا يشقى الانسان فى حياته النبوية حتى يدخل الجنان لا يمسهم فيها نصب و لا يكونون ظمآن ،

و الصلاة و السلام على خاتم الانبياء و المرسلين و على آله الطيبين و الطاهرين و صحابته نجوم الهدى وسرج السالكين الذين صحبوا النبى الاكرم و ثبتوا على الايمان مع قلة المساعدة من الناس و مخالفة الامم، فما ضعفوا و ما استكانوا بل استقاموا كالجبل الأصم.

অতঃপর আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথী '**সাহাবীগণের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা আল্‌ কুরআন ও সহীহ্‌ সুন্নাহ্‌র আলোকে এবং এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌র অবস্থান**' বিষয়টি যেহেতু অতীব গুরুত্বপূর্ণ, গুরুগম্ভীর এবং স্পর্শকাতর সেহেতু আপনাদের সুস্পষ্ট অবগতির জন্য কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচনা করব। কেননা সাহাবীগণের সততা, সরলতা, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও ঐকান্তিকতা ধোঁয়াশাচ্ছন্ন হলে পূর্ণ ইসলামের ছবি ধুম্রজালে আচ্ছন্ন হবে। এটা এজন্যই যে, পরবর্তী প্রজন্ম তাঁদের মাধ্যমেই ইসলামকে পেয়েছে। ইসলাম বিরোধী লবি সঙ্গত কারণেই পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক সাহাবীগণকেই লক্ষ্য করেছে এবং তাঁদের মর্যাদার জন্য আপত্তিকর বহুকিছু সৃষ্টি করেছে। প্রথম অধ্যায়ে আমি সাহাবী শব্দের শাব্দিক ও ইসলামী পারিভাষিক ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করব — ইনশাআল্লাহ্‌।

ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقى الا بالله عليه توكلت و اليه انيب.

প্রথম অধ্যায়
সাহাবী পরিচিত

আরবী সাহাবী 'صحابى' শব্দটি 'সুহবাতুন' ধাতু হতে উদ্ভুত। যার অর্থ হল বন্ধু, মিত্র ও সহচর। আল্‌ কুরআনে শব্দটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (আল্‌ মুজামুল অসীত্ব, ৫০৭ পৃঃ)।

আরবী صَاحِب (সাহিব) শব্দের অর্থ সহচর, কোনো কিছুর মালিক (যেমন صَاحِبُ الْبَيْتِ বাড়িওয়ালা) কোনো কিছুর দায়িত্বশীল। আল্লাহ্‌ বলেন — و ما جعلنا اصحاب النار الَّا ملاَ ئكةً. আমি নরকের দায়িত্বশীল ফেরেশতাদেরকেই নির্দ্ধারণ করেছি (সূরাতুল মুদ্দাস্‌সির ৩১)। কোনো মাযহাব ও মতের অনুসারীদের জন্যও উক্ত শব্দের ব্যবহার হয়, যেমন আসহাবে আবী হানীফাহ ও আস্‌হাবে শাফিয়ী। এর বহুবচন 'সাহবুন' ও 'আসহাবুন' (আল মুজামুল অসীত্ব ৫০৭ পৃঃ)। সাহাবী হলেন من لقى النبى ﷺ مؤمناً به و مات على الاسلام যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে তাঁর প্রতি ঈমানের অবস্থায় সাক্ষাত করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুও হয়েছে ঈমানের উপরে (প্রাগুক্ত)।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলেন —

من صحب النبى ﷺ سنة او شهرًا أو يومًا أو ساعة

اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ ঃ মুহাজিরীন ও আনসারদের মধ্যে যাঁরা প্রথমেই (ঈমান আনার ব্যাপারে) অগ্রণী ছিলেন এবং যাঁরা ইখলাসের সাথে তাঁদের অনুসরণ করেছেন আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন এবং তাঁরাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। (আল্লাহ্) তাঁদের জন্য এমন জান্নাত নির্মাণ করে রেখেছেন যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত রয়েছে। তাতে তাঁরা স্থায়ীভাবে থাকবেন। আর এটাই হল বড় সাফল্য (সূরা তাওবাহ, ১০০)।

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا.

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, যখন তাঁরা আপনার সাথে বাইআত করছিলেন গাছের নীচে, আল্লাহ্ জেনে গেছেন তাঁদের হৃদয়ে যা আছে। তাই তিনি তাঁদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করেন এবং তাঁদেরকে তিনি আসন্ন বিজয় দান করেন (মক্কা বিজয়) (সূরাতুল ফাত্‌হ, ১৮)।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ، ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا.

أو رآه مومنا به من أصحابه، له من الصحبة على قدرما صحبه.

যে ব্যক্তি নাবী (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনত তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন সেটা বৎসর, মাস, দিন অথবা কিছু সময়ের জন্যও হতে পারে। কিংবা তাঁর সাথে শুধুমাত্র সাক্ষাত করেছেন। এমন ব্যক্তিবর্গই হচ্ছেন তাঁর সাহাবী। যিনি যেমন সঙ্গ দিয়েছেন সঙ্গ অনুযায়ী তিনি মর্যাদার অধিকারী (আল্ কিফায়াহ্ ৬৯ পৃষ্ঠা, ফাতহুল মুগীস ৭৭ পৃষ্ঠা, মুকাদ্দামাহ্ ইবনু সালাহ্ ১৪৬ পৃষ্ঠা)।

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন —

من صحب النبى ﷺ أو رآه من المسلمين فهو من اصحابه.

মুসলিমদের মধ্যে যিনি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে থেকেছেন অথবা তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনিই হচ্ছেন তাঁর সাহাবী (ফাতহুল বারী ৭/৩ পৃঃ)।

ইমাম বুখারী ও তাঁর স্বনাম ধন্য উস্তাদ ইমাম আহমাদ্ ইবনু হাম্বালের উক্তি দ্বারা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে স্বল্প সময়ের জন্য কোনো ব্যক্তি যদি প্রকৃত ঈমান সহ নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে মিলিত হয়ে থাকেন তাহলে তিনি নাবীর (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সাহাবীকূলের মধ্যে গণ্য হবেন, ইনশাআল্লাহ্।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্ কুরআনে সাহাবীগণের মূল্যায়ণ

কুরআনুল কারীম হচ্ছে এমন একখানি ঐশীগ্রন্থ যার মধ্যে সত্য বিরোধী কোনো তথ্য সন্নিবেশিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। সেখানে নাবী মুহাম্মাদের সহচরবৃন্দের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আলোচনা এসেছে। তা পাঠ করে এমন ব্যক্তিবর্গের জন্য শ্রদ্ধার আতিশয্যে হৃদয় আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠে। বিনম্র চিত্তে তাদের জন্য স্বতস্ফূর্তভাবে জিহ্বা আন্দোলিত হয়। উচ্চারিত হয় রাযিয়াল্লাহু আনহুম। আল্লাহ্ তুমি তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।

মহান আল্লাহ্ বলেন —

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ

অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং তাঁর সাথে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা কাফিরদের জন্য বজ্র কঠিন এবং পরস্পরে দয়া পরবশ, আপনি তাঁদের রুকু ও সাজদার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করতে দেখবেন। তাঁদের পরিচিতি হল তাঁদের কপালে সাজদাহ্‌র ছাপ। এটাই তাঁদের নমুনা তাওরাতে আছে। আর তাঁদের নমুনা ইঞ্জিলে রয়েছে যে তাঁরা (পরস্পরে) ওই ফসলের ন্যায় যে নিজের অঙ্কুর উদ্গামন করে এবং তাকে শক্ত করে অতঃপর তা মোটা হয় এবং নিজের কান্ডের উপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়। চাষীদের আনন্দ দেয় (সাহাবীগণ পরস্পরে মিলিত একটি শক্তি, যারা স্বীয় শক্তিতে মহীয়ান)। কাফিরগণের জন্য এঁরা গাত্রদাহ। তাঁদের মধ্যে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য ক্ষমা প্রদান ও বড় প্রতিদানের অঙ্গীকার আল্লাহ্ করেছেন (সূরাতুল ফাত্‌হ্ ২৯)।

তিনি আরো বলেন —

لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰتَلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ قٰتَلُوْا وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা মাক্কা বিজয়ের পূর্বে দান করেছে ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে তারা মর্যাদার দিক থেকে অনেক বড় তাদের হতে যারা (মাক্কা বিজয়ের) পরে দান করেছে ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। (যদিও) তিনি প্রত্যেকের জন্য উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে (মহান) আল্লাহ্ খবর রাখেন (সূরাতুল হাদীদ, ১০)।

আরও বলেন —

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ.

অর্থ ঃ (সাহাবায়ে কিরাম) এমন মানুষ যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনাবেচা তাঁদেরকে অবচেতন করে রাখেনা আল্লাহ্‌র যিক্‌র (স্মরণ) স্বলাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান হতে। কেননা তাঁরা সেই দিনকে ভয় করেন যেদিন হৃদয় ও চক্ষু সমূহ আতংকিত থাকবে (সূরাতুন নূর, ৩৭)।

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ.

অর্থ ঃ দরিদ্র দেশত্যাগকারী (সাহাবায়ে কিরাম) যাঁরা বহিস্কৃত হয়েছেন নিজের বাসস্থান ও সম্পদ হতে, তাঁরা এমনটা অবলম্বন করেছেন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তার সন্তোষ কামনার জন্য। তাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করেন। এঁরাই হচ্ছেন সত্যবাদী (মুসলিম) (সূরাতুল হাশর ৮)।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের জন্য আল্লাহ্ বলেন — اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. তোমরা যা খুশি কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি (সহীহুল বুখারী ৩৯৮৩, সহীহ্ মুসলিম ২৪৯৪)।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের অনুবাদ পাঠের পর মনে হয় কোনও সত্যান্বেষী পাঠকের হৃদয়ে শংসয়ের অবকাশ থাকবেনা যে, সাহাবীগণ হচ্ছেন আল্লাহ্‌র প্রিয়তম বান্দাদের অন্যতম। মহান আল্লাহ্ দ্বীনের বাণীসমূহকে নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বাচনিক শ্রবণ, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য তাঁদেরকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরা উক্ত দায়িত্বপূর্ণ আমানাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বান্দাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

সঙ্গত কারণেই আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের আকীদাহ্‌তে বিশ্বাসী সমগ্র মুসলিম কমিউনিটীর বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরাম একমত যে সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন উম্মাতের সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ ও দ্বীনের সব চাইতে জ্ঞানী। এ বিষয়ে চরম সাক্ষ্যের জন্য আমরা নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস সমূহকে এবার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই।

তৃতীয় অধ্যায়
রসূলুল্লাহ্‌র হাদীস সমূহে সাহাবীগণের বর্ণনা

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول ﷺ لا تسبوا أصحابى فو الذى نفسى بيده لو أن احدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما ادرك مد أحدهم و لا نصيفه.

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, "তোমরা আমার সাহাবীদের গালমন্দ কোরো না। ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত তূল্য দান করে তাহলে তা আমার একজন সাহাবীর এক মুদ্ পরিমাণ অথবা তার অর্দ্ধেকের সমানও হতে পারবে না" (সহীহ্ মুসলিম ২৫৪০)।

عن ابن عباس رضي قال قال رسول الله ﷺ من سب أصحابی فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি আমার সাহাবাকে গালি দিবে তার উপরে আল্লাহ্, ফেরেশতামণ্ডলী এবং সমগ্র মানবের (লা'নাত) অভিশাপ বর্ষিত হোক" (সহীহ্ জামি স্বগীর ৬২৮৫)।

عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ خير أمتى القرن الذين يلونى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه و يمينه شهادته.

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, "আমার উম্মাতের ওই দলটি সর্বোত্তম যে দলটি আমার সময়ে আছে (অর্থাৎ সাহাবী)। অতঃপর তাঁদের সময় যাঁরা মিলিত হবে (অর্থাৎ তাবেয়ী)। তারপর তাঁদের সাথে যাঁরা মিলিত হবে (অর্থাৎ তাবা'তাবেয়ী)। তারপরে যে লোকেরা আসবে (কখনও) তারা সাক্ষ্য প্রদানের পর কসম খাবে, আবার কখনও কসম খাওয়ার পর সাক্ষ্য দিবে" (সহীহ্ মুসলিম ২৫৩৩)। (মূলতঃ নিজেদের দুর্বল ও অসৎ তথ্যকে সুদৃঢ় করার জন্য কসম খাবে। অথচ মুমিনের প্রতিটি কথাই সততার প্রতীক হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। সাহাবায়ে কিরাম এমন দুর্বলতার উর্দ্ধে ছিলেন।)

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

النجوم أمنة للسماء فاذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد و أنا أمنة لأ صحابى فاذا ذهبت أتى اصحابى ما يوعدون و أصحابى أمنة لأمتى فاذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون.

তারকাসমূহ আকাশের নিরাপদের প্রতীক, তারকা খসে পড়লে আকাশের জন্য যা (আল্ কুরআনে) বলা হয়েছে তা সংঘটিত হবে (অর্থাৎ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে)। আমি হচ্ছি আমার সাহাবীদের জন্য নিরাপত্তার প্রতীক, আমি চলে গেলে আমার সাহাবীদের জন্য যা হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা ঘটবে। আমার সাহাবীগণ হচ্ছেন আমার উম্মাতের জন্য নিরাপত্তার প্রতীক, তাঁরা বিগত হলে আমার উম্মাতের জন্য ঘোষিত সমস্যাগুলি আরম্ভ হয়ে যাবে (সহীহ্ মুসলিম, ২৫৩১)।

সাহাবীগণের পর হতে উম্মাতের মধ্যে শির্ক ও বিদ্আতের যে রমরমা শুরু হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ফিত্না-ফাসাদ তার সমস্ত রাস্তা খুলে দিয়ে মুসলিম উম্মাহকে জর্জরিত করে রেখেছে। উম্মাত টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যত বাণীর ব্যাখ্যা আমরা পরতে পরতে লক্ষ্য করছি। আল্লাহ্ আমাদের হিফাযত করুন — আমীন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার বলেন —

لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة افضل من عمل احدكم عمره.

তোমরা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাহাবীদের গালী দিওনা, তাদের কিছুক্ষণের ইবাদাত তোমাদের সারা জীবনের ইবাদাত অপেক্ষা উত্তম (সহীহ্ ইবনু মাজাহ্ ১৫৮)।

عن البراء بن عازب قال قال رسول الله ﷺ من احب الانصار احبه الله و من ابغض الانصار أبغضه الله.

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি আনসারকে ভালোবাসল, আল্লাহ্ যেন তাকে ভালোবাসে আর যে ব্যক্তি আনসারের সাথে শত্রুতা করল, আল্লাহ্ যেন তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে" (প্রাগুক্ত ১৫৯)।

এই মর্মে অসংখ্য হাদীস এসেছে যাতে সমগ্র সাহাবী মুহাজির ও আনসারী খুলাফায়ে রাশেদীন, আবূ বাকর, উমার, উসমান ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সহ অনেকের সম্পর্কে মহান নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অনেক আশাব্যঞ্জক মন্তব্য করে রেখেছেন। ইনশা-আল্লাহ্ কিয়ামতের দিনে তাঁরা সে মর্যাদাতে ভূষিত হবেন। সুতরাং তাঁরা যে আমাদের অনুকরণীয়, বরণীয় এবং সব চাইতে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী মানুষ আর যাই হোক সে প্রকৃত ঈমানদার নয়।

পরবর্তী অংশ ১৬ পাতায়

ইবাদাত কবুলে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব

মোঃ মোহসিন আঞ্জুম

জ্বীন ও ইনসানকে বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ্ তাআলা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত-বন্দেগী করার জন্য সৃষ্টি করেছেন (৫১/৫৬)। কুরআনুল কারীমের এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাটি সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলিম অবগত। সেইসঙ্গে একথাও সকলেই অবগত যে, কুরআন ও হাদীসে ইবাদাত কবুল হওয়ার পথ-পদ্ধতি ও শর্তাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিজ আমলের দ্বারা সবিস্তার সঙ্গী-সাথীদের শিখিয়েছেন। সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম শিখিয়েছেন পরবর্তী জেনারেশনকে। এইভাবে পর পর নিজে শেখা ও অন্যকে শেখানোর ধারা-বিগত প্রায় দেড় হাজার বছর হতে অব্যাহত রয়েছে। কাগজ ও মুদ্রণ যন্ত্র আবিস্কৃত হওয়ার পরে শেখা ও শেখানোর মহৎ কাজটিকে আঞ্জাম দেওয়া মুবাল্লিগ, মুদার্‌রিস ও ওলামায়ে দ্বীনের পক্ষে অতিশয় সহজ-সরল হয়ে পড়েছে। আরবী হতে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় কুরআন-হাদীস অনুদিত হওয়ায় এখন দ্বীনি মসলা-মাসায়েলকে অনায়াসে আত্মস্থ করার পথ আরও সুগম হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান, টেকনোলজির দৌলতে পৃথিবীর আর দশটা জ্ঞান-বিদ্যার মত ইসলামকেও জানা ও বুঝার রাজপথ সুপ্রশস্ত হয়ে পড়েছে। প্রয়োজন কেবল ব্যক্তিগত খাহীশের জিজ্ঞাসা ও জিগীষার। হাতের কাছেই সবকিছু মওজুদ রয়েছে, দরকার কেবল জানবার ইচ্ছা ও আকাঙ্খার। সত্যি বলতে কি, এখন আমাদের অনেক কিছুই জানাও হয়ে গেছে, প্রতি মুহূর্তে কোনো না কোনো সূত্রে আমরা-আমাদের ইবাদাতের কবুলিয়্যাত ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানার্জনে সক্ষম হয়ে উঠছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, জানাজানির পরে মানা-মানির ব্যাপারে আমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ চরম ঔদাসীন্যই প্রদর্শন করে চলেছি। কথাটি শুনতে ও মানতে আমাদের যতই কষ্টবোধ হোক না কেন, একথা প্রায় যোলো আনাই সত্য যে, আলিম-বেআলিম নির্বিশেষে একালে আমরা প্রায় সকলেই জ্ঞাতসারে ইবাদাত বন্দেগীর মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডেও হক্কের স্থলে বাতিল পথ-পদ্ধতিকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি। স্বলাত-সওম-যাকাত-হজ্জ-দুআর ক্ষেত্রে আজও আমরা যারা আন্তরিকভাবে পাবন্দ ও যত্নবান, তারাও সবকিছু জেনে বুঝেই কবুলিয়্যাতের বিপরীত আচরণে ডুবে রয়েছি। প্রিয় পাঠক! আসুন আমরা এখানে আমাদেরই প্রাত্যহিক আচরণ হতে কিছু অবাঞ্ছিত তথ্য সমীক্ষা করে দেখি।

সমস্ত শ্রেণির ইবাদাত ও দুআর গ্রহণ যোগ্যতার এক মৌল শর্ত হচ্ছে বান্দার হালাল উপার্জন, হালাল রুজি। আকীদা-ঈমান-তরীকা এই তিন মৌল উপাদানের বিশুদ্ধতার পরে পরেই প্রত্যেক বান্দাকে নিজের রোজগার ও রুজির হালাল হওয়ার প্রতি সবিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠতেই হবে। কেননা অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদে লালিত-পালিত মুসলিমের স্বলাত-সওম-যাকাত-হজ্জ-দুআ কোনো ইবাদাতই যে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে কবুল হবে না — একথা কুরআন-হাদীসে অত্যন্ত সহজবোধ্য, সরল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ সহযোগেও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানে-মতলবসহ কুরআনের পাঠকমাত্রই জানেন যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রথমতঃ তাঁর প্রত্যেক নাবী রসূলকে হালাল রুজির নির্দেশ দিয়েছেন তথা প্রত্যেকেই আপনাপন কওমের কাছে হালাল রুজি-রোজগারের প্রয়োজন ও গুরুত্ব স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেন। আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে প্রিয় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র এবং তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন'' (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুয্ যাকাত)। আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকে সেই আদেশই দান করেছেন যা তিনি তাঁর নাবীগণকে করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'হে প্রেরিত পুরুষ, হালাল আহার্য গ্রহণ করো এবং নেক আমল করতে থাকো' (২৩/৫১) আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকেও বলেছেন, 'হে মুমিনগণ, আমি তোমাদের যে হালাল আহার্য দান করেছি, তা হতেই আহার করো' (২/১৭২)। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এমন এক ব্যক্তির উদাহরণ তুলে ধরলেন যে মানুষটি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এক সম্মানিত স্থানে উপস্থিত হয়েছে, তার শরীর ধূলো বালিতে ভরে রয়েছে; নিজের দু হাত আসমানের দিকে প্রসারিত করে করুণ কণ্ঠে বলছে, 'হে আমার রব, হে আমার রব!' - কিন্তু তার খাদ্য বস্তু হারাম

তথা সে হারামেরই দ্বারা প্রতিপালিত — এরূপ মানুষের দুআ কীরূপে কবুল হতে পারে" (সহীহ্ মুসলিম ১০১৫)।

নিঃসন্দেহে এটা একটা অতিশয় শিক্ষাপ্রদ হাদীস। এতে একযোগে আল্লাহ্ তাআলা ও প্রিয় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আদেশ-নিষেধ ব্যক্ত হয়েছে। উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ ভালো, — তারও প্রমাণ মওজুদ রয়েছে।

মিশকাত শরীফের অন্য একটা হাদীসে অবৈধ উপার্জনের অশুভ প্রভাব জীবন-মরণের সবক্ষেত্রেই পড়ার কথা ভীষণ ভয়ংকরভাবে বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র কোনো বান্দা হারামপথে ধনোপার্জন করার পরে সেই ধন আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে তা কবুল করা হবে না। নিজের জন্য অথবা পরিবারের জন্য খরচ করলে বরকত থাকবে না। অবৈধ মাল রেখে মৃতুবরণ করলে সেসব মাল তার জন্য জাহান্নামের সম্বলে পরিণত হবে। আল্লাহ্ তাআলা পাপের মাধ্যমে পাপ দূর করেন না, বরং সৎ কাজের দ্বারাতেই পাপ দূর করেন।"

হারামখোর মুসলিমের ইহকাল-পরকাল সবই যে নষ্ট হতে বাধ্য সে কথাটি এখানে ভয়ংকর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। একথাও বোঝা যাচ্ছে, ভালো কথা ও কাজ মানুষের জন্য 'সাদকায়ে জারিয়া' স্বরূপ কিন্তু মন্দ কথা ও কাজ মূলত 'বদকারে জারিয়া' অর্থাৎ পরবর্তী জেনারেশানের জন্য সেইসঙ্গে মন্দ মানুষটির পরকালের জন্যও চরম অভিশাপ।

একথা কে না জানে যে, ভালোর ফল ভালো আর মন্দের ফল মন্দ হয়। আমের আঁটিতেই আম চারা জন্মায়, আমড়ার গাছে কখনও আম ফলে না। আর আল্লাহ্ তাআলা যে স্বয়ং পবিত্রতম হওয়ায় কেবলমাত্র পবিত্র বস্তুর দান-খয়রাতকেই স্বীকার করবেন, একথাটা তো সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিতেও বোঝা যায়। আমরা ঈমানওয়ালা হওয়ায় উপরোক্ত বর্ণনার সারাংশ সকলেই বুঝি, খুব ভালো ভাবেই বুঝি। এ কথাও বেশ বুঝি যে, স্বলাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আমরা বাস্তবিক নিয়ম পদ্ধতির যতই অনুসরণ করি না কেন, আমাদের আয়-উপার্জনে ও খাদ্যে-বস্ত্রে যদি হারামের স্পর্শ থাকে তবে আমরা আশানুরূপ পূণ্যার্জনে ব্যর্থ হবই। সবকিছু জেনে বুঝেও একালে আমরা নির্বিচারে সুদ, ঘুষ, আত্মসাৎ, খেয়ানত, পণ, বিশ্বাসঘাতকতা, ফাঁকিবাজি ইত্যাদিকে আমাদের আয়-উপার্জনের মাধ্যমে পরিণত করে দিয়েছি। যাকাত আদায়ে উদাসীনতা দেখিয়ে হালাল মালকেও হারামে রূপান্তরিত করে দিচ্ছি। জীবনের এক বৃহত্তর হিস্সায় এসব কাবীরা পাপে ডুবে থাকার পরে শেষ বেলায় সপরিবারে পবিত্র হজ্জ উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা দিচ্ছি। আমাদের মন ও মননে এতটুকুও ভয়ভীতি থাকে না যে, প্রিয় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, "তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম আর সে হারামের দ্বারা প্রতিপালিত এরূপ লোকের দুআ কীভাবে কবুল হতে পারে।"

বোঝা গেল, হারাম উপার্জনের অর্থে হজ্জ করলে কোনো মুসলিমই হজ্জের পরে 'নবজাতকের মতন নিষ্পাপ' হওয়ার আশা করতে পারে না। পরিতাপের কথা, বর্তমানকালে আমাদের মন-মানস ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের সুখ শান্তিকে পারলৌকিক চিরস্থায়ী জীবনের তুলনায় ঢের বেশি প্রাধান্য দিতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করে না। বিশ্বাস আছে, কিন্তু ভয় নেই, অবিচল ভক্তিও নেই। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' — এখন এই আমাদের সবচেয়ে বড়ো চিন্তা। এই নাপাক চিন্তাকে সফল করতে এখন আমরা সকলেই অর্থ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছি। কোন কোন পথে কীভাবে আমাদের বেশি বেশি উপার্জন হবে, এখন আমাদের এটাই প্রতিমুহূর্তের চিন্তা ভাবনা। আমাদের এই দুর্ভাগ্যজনক বিচিত্র মন-মানস সম্পর্কে দেড় হাজার বছর পূর্বে আমাদের প্রিয় রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, "মানুষের সংসারে এমন এক যুগ-জামানা আসবে, যখন মানুষ এ-কথা গ্রাহ্যই করবে না যে সে যে মাল উপার্জন করেছে তা হালাল না হারাম।"

প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা এ-কালের মুসলিমরা উপরোক্ত যুগেরই অদ্ভুত ও বিচিত্র প্রাণী নই কি? মুসলিম ছাড়া ইহুদী-নাসারা-মুশরিক -নাস্তিক প্রভৃতিরা বলতে পারে, "সেই তো ভালো মন যাহা চায়, হেসে খেলে জীবনটা যদি চলে যায়।" মুসলিম হিসাবে আমাদেরকে তো অবশ্যই ভাবতে হবে, ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা এই সুন্দর বসুন্ধরাটি আসলে 'মাকড়সার জাল' ছাড়া অন্য কিছুই নয়। বড়োজোর মুমিনের জন্য এ-একটা জেলখানা। এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই, স্বেচ্ছাচারিতা নেই। আছে পদে পদে নিয়ম শৃঙ্খলা।

ধৈর্য, সংযম, সহনশীলতা আর প্রচণ্ড রকমের নির্লোভতা। বেলাগাম ভোগের চেয়ে অনাবিল ত্যাগের মহিমায় ইহ-পরকালকে অত্যুজ্জ্বল করে তোলাই হলো প্রকৃত মুমিনের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এজন্যই একজন প্রকৃত মুমিনের অন্তর্চক্ষুতে এ-পৃথিবীটি পরকালের কৃষিক্ষেত্র স্বরূপ। কৃষিক্ষেত্রে ফসল ফলানো হয় কী জন্য? জী হাঁ, ঘরে তোলার জন্য ক্ষেতে রাখার জন্য নয়। প্রকৃত মুমিন জানে যে, আসল ঘর এখানে নয়, নিশ্চিতভাবেই সেখানে অর্থাৎ 'সুম্মা ইলায়হি তুরজাউন'। অতএব দূরন্ত মন নিয়ে এখানে খেলা করার চেয়ে প্রকৃত জ্ঞান নিয়েই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সব কারবার করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয় কি?

মন ও জ্ঞান নিশ্চয়ই দুটো জিনিস। প্রথমটি চঞ্চল ও চুলবুলে, তাই হাল্কা। দ্বিতীয়টি গভীর ও গম্ভীর তাই স্থির-সুস্থির। আদম (আলাইহিস্ সালাম) কে সম্মান প্রদর্শনের আদেশ পালনের ক্ষেত্রে ইবলিশ আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তার চঞ্চল ও চুলবুলে মনের। মননশীলতা ও জ্ঞানকে সে প্রশ্রয় দেয়নি, ফলে সে বিভ্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু যারা জ্ঞান ও মননের আলোকে প্রভুর আদেশকে বিশ্লেষণ করেছিল, তারা মান্য করতে বিন্দুমাত্রও দেরি করেনি, ফলে তারা প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়েছিল। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, যাকে ভালোবাসেন, তাকে দ্বীনের ইলম অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান দানে ভূষিত করেন। আরও বলা হয়েছে যে, জ্ঞানী ও অজ্ঞান এক হতে পারে না। আলো ও অন্ধকার এক নয়। এজন্যই দ্বীন ইসলাম দ্বীনের জ্ঞানীকে 'ওয়ারিশাতুল আম্বিয়া' এই দুর্লভ খেতাবে ভূষিত করেছে। দায়িত্ব দিয়েছে যে, ওলামায়ে দ্বীনই মিল্লাতকে নেতৃত্ব দেবেন, মসজিদে ইমামতি করবেন, মাদ্রাসায় মুদার্‌রিসী করবেন, সমাজে মুবাল্লিগী করবেন। স্বয়ং আমল করবেন আর আমজনতাকে আমল করতে শেখাবেন। এ রকম দায়িত্ববোধ ও সুসম্মানের কথা কী? সুখের কথা যে, ওলামায়ে দ্বীন যুগযুগান্ত ধরে এ সকল মহৎ কাজ আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন। কিন্তু পরিতাপের কথা যে, বিংশ শতাব্দী হতে ওলামায়ে দ্বীনের একাংশ আয়-উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের তামীজ হতে বেপরোয়া মনোবৃত্তি প্রদর্শন করে চলেছেন। ফলে আমাদের সমাজ জীবনে দুষ্প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। মন্দদের জন্য ভালোরাও সমালোচিত হচ্ছেন।

এক শ্রেণির অর্থ লোভী, পেশাদার বক্তা -আলিম মসজিদ-মাদ্রাসার জালসায় আমন্ত্রিত হওয়ার বিনিময়ে ফীজ বাবদ নির্দ্বিধায় সানন্দে গ্রহণ করছেন হাজার হাজার টাকা। ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-তুমারের বিনিময়ে চেয়ে নিচ্ছেন মোটা অঙ্কের টাকা পয়সা। মিথ্যা আদায়কারী সেজে মসজিদ-মাদ্রাসার নামে হড়প করছেন চাঁদা। কেউ কেউ মসজিদ-মাদ্রাসার অর্থমন্ত্রী সেজে আত্মসাৎ করছেন গচ্ছিত সম্পদ। সরকারী ও বেসরকারী মাদ্রাসার সার্ভিসে অনেকেই ডিউটি পালনের ক্ষেত্রে চরম ফাঁকিবাজি দেখিয়েও পূর্ণ মাসোহারা তুলে নিচ্ছেন খুশী খোশালীতে। বয়স চুরি করে সরকারী মাদ্রাসায় সত্তর আশি বছর বয়স পর্যন্ত চাকরি করে যাচ্ছেন এমন চালাক-চতুর আলিমের সংখ্যাও কম নয়। এমনকী একালের কিছু দুনিয়াদার আলিম সুদী কারবারেও গা ভাসিয়া দিয়েছেন। সুদের টাকায় গাড়ি-বাড়ি করছেন, সূদের পুঁজিতে সন্তানদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। এ সবই যে উপার্জনের হারাম পথ ও পাথেয়, তাতে সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ একারণেই আল্লাহ্ তাআলা সূরাহ্ আরাফ এর ১৭৫-১৭৬ আয়াতে আল্লাহ্‌র আয়াতকে জাননেওয়ালা একশ্রেণির দুনিয়াদার আলিমকে তিরস্কৃত করেছেন কঠিন ভাষায়।

ইবাদাতের ও দুআর কবুলিয়্যাতে যখন হালাল উপার্জনের এতই গুরুত্ব, তখন 'তাওবাতুন নাসূহা'র মাধ্যমে আসুন আমরা প্রকৃত ইসলাহের পথে ফিরে আসি। আল্লাহ্ আমাদের সঠিক বোধ দান করুন — আমীন।

---

১৩ পাতার পর

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের ওই ভাইদের ক্ষমা কর যাঁরা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছেন। আমাদের হৃদয়ে মুমিনদের জন্য কোনো প্রকার প্রতিহিংসা সৃষ্টি কোরো না, হে আমাদের প্রতিপালক নিশ্চয় আপনি দয়ালু মেহেরবান (সূরাতুল হাশর, ১০)।

সাহাবা কিরামের জন্যই মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে এই দুআ শিক্ষা দিয়েছেন। যদিও সাধারণতঃ প্রত্যেক পরবর্তী মুমিন পূর্ববর্তী মুমিন ভায়ের জন্য দুআ করবে ও মনকে তাদের জন্য পরিস্কার রাখবে।

শেষ পর্ব

পর্দা প্রথার সমর্থনে রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান

মোঃ মোয়াজ্জেন হোসেন

এই পার্থক্যগুলি সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দির 'এনসাইক্লোপিডিয়া' প্রণেতা 'নারী' শব্দের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন, ''নারী ও পুরুষের মধ্যে যদিও যৌনাঙ্গ সমূহের গঠন ও আকৃতির পার্থক্যটাই সর্বপ্রধান, কিন্তু পার্থক্য কেবল এই একটি ক্ষেত্রে নয়। নারীর মাথা হতে পা পর্যন্ত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পুরুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। এমনকী নারী ও পুরুষের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাহ্যত একান্তই একরূপ মনে হয়, সেগুলিও প্রকৃতপক্ষে সামঞ্জস্যহীন।''

এবার চুলচেরা বিশ্লেষণে আসা যাক ১নং পার্থক্যটিকে নিয়ে।

পুরুষরা হল ক্ষার (Alkali) ধর্মী এবং নারীরা হল অম্ল (Acid) ধর্মী। এটি একটি বিভাগীয় আলোচনার বিষয়।

রসায়ন বিদ্যা বলে — ক্ষার ও অম্ল যৌগ প্রতিক্রিয়ায় বিক্রিয়া হলে পানি ও লবণ তৈরি হয় এবং এই লবণে অম্লত্ব নষ্ট তো হয়ই, এমনকী অম্লের উৎপাদন আনুপাতিকহারে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ক্ষারের উপস্থিতি থেকেই যায়।

রসায়নের এই বিশ্লেষণে পাওয়া গেল ক্ষার অর্থাৎ পুরুষের সাথে অম্ল অর্থাৎ নারীর অবৈধ অবাধ মেলামেশা হয় তবে এই যৌগ প্রতিক্রিয়ায় অম্লত্ব অর্থাৎ নারীত্ব হারিয়ে যায় এবং অম্লের অর্থাৎ নারীত্বের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ঐ নারীর দৈহিক পরিকাঠামো ও মানসিক অবস্থানটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে নারী থাকলেও আচরণ বিধি পুরুষত্বে রূপান্তরিত হয়। এই রসায়নের বিশ্লেষণে আরো দেখতে পাওয়া যায়, অম্লের বৈশিষ্ট্য হল — ''অম্ল জাতির জীবকোষ অত্যন্ত কোমল হয়।''

যখন ঐ নারী পুরষের সাথে অবৈধ মেলামেশা করে থাকে তখন তার নারীসুলভ আচরণ অর্থাৎ কোমলতা ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়ে তার অম্লত্ব হারিয়ে ক্ষারের উপস্থিতি নিয়ে পুরুষের কাঠিন্য মনোভাবে পৌঁছায়। তাই ঐ অবৈধ অবাধ মেলামেশাকারিনী নারীদের দেখা যায় পুরুষদের ভূমিকায়।

তাই নারীদের প্রয়োজন তাদের মান-সম্মান, মর্যাদা, মূল্য, অম্লত্ব নিরাপদে অক্ষুন্ন রাখার জন্য পুরুষদের সাথে অবৈধ অবাধ মেলামেশা বন্ধ করা। অপর পুরুষদের থেকে বহু দূরত্বে থাকা। কিন্তু বৈধতার আবেশে একজন নারী একজন পুরুষের সাথে মিলে থাকলে যে বিক্রিয়া হয় তাতে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না বললেই চলে। তাই নিরাপদে থাকে।

অপর পুরুষ ও অপর নারীর মধ্যে দৈহিক দুরত্ব তো থাকতেই হবে, এমনকী মানসিক দূরত্বও বজায় রাখতে হবে। এই দূরত্বের সফলতা আনতে পারে একমাত্র পর্দা প্রথা। এই পর্দা প্রথা পোশাকের মধ্য দিয়েও হতে পারে আবার প্রাচীর দ্বারাও হতে পারে। প্রাচীর দ্বারা পর্দার কথা আল্লাহ্ সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে বলেছেন যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আর পোশাকের দ্বারা পর্দার কথা সূরা নুরের ৩০ ও ৩১ নং আয়াতে বলেছেন।

এবার দেখা যাক বিশ্ব ও শেষ মহাত্মা মহাপুরুষ নেতা নাবী-রসূল কী বলেছেন। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ ذَكَرَ الْإِزَارَ فَالْمَرْئَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ تُرْخِىْ شِبْرًا فَقَالَتْ اِذًا تَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فَذِرَاعًا لَا تَزِيْدُ عَلَيْهِ.

অর্থঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর স্ত্রী উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে লুঙ্গি পরা সম্পর্কে আলোচনার সময় বলেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ! নারীদের ঝুল কতটা হবে ? তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, পুরুষ হতে আধ হাত বেশি। উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তাহলে নলার কিছুটা অনাবৃত থাকবে। পুনঃ তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তাহলে একহাত ঝুল দিবে। তার বেশি নয় (আবু দাউদ, মালেক, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, মিশকাত হাঃ নং ৪১৩৯)।

وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِىْ عَلْقَمَةَ (رضى) عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَلٰى عَائِشَةَ (رضى) وَ عَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيْقٌ فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ (رضى) وَ

كَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا.

অর্থঃ আলকামাহ্ ইবনে আবি আলকামাহ থেকে বর্ণিত, তাঁর মা থেকে তিনি বর্ণনা করেন, হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান (আব্দুর রহমানের মেয়ে) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট একখানা পাতলা ওড়না পরে আসলেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঐ ওড়নাকে ছিঁড়ে ফেললেন এবং একখানা মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন (মালেক, মিশকাত, হাঃ নং ৪১৭৮)।

আল্লাহ্ বলেন —

يَـاَيُّهَـا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْـنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

অর্থঃ হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসী রমণীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (মুখমণ্ডলের) উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা আহযাব, আয়াত ৫৯)।

উপরোল্লিখিত হাদীস দুটিতে বলা হয়েছে, নারীদের পায়ের গোড়ালীটুকুও যেন অপর পুরুষ দেখতে না পাই। আর পাতলা ওড়না নারীদের পরিধান করা সমর্থনযোগ্যও নয়। তারপর আল্লাহ্ বলেন, নারীর মুখমণ্ডলও যেন পরপুরুষ দেখতে না পায়। এখান থেকেও বুঝা গেল নারীর মাথার চুল থেকে শুরু করে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও গোড়ালী পর্যন্ত অর্থাৎ শরীরের কোন অংশই যেন অপর পুরুষের নজরে না আসে। একেই বলা হয় পর্দা বা গোপনীয়তা অর্থাৎ আওরাত।

এবারে আসি, নারীদের এই দেহ সৌষ্ঠবকে অপর পুরুষ থেকে অগোচরে রাখতে হবে পোশাকের মধ্য দিয়ে কেন? এর উত্তর পাওয়া যাবে পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রে। এ ব্যাপারে পদার্থ বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীরা কী সমাধান করেন দেখা যাক। বিশ্বের বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থাগুলোর মন্তব্য কী? তাঁদের অভিমত কী? এটাও দেখা যাক।

International committee on Radiation Protection (1959, 1966) মানুষের জন্য 'তেজস্ক্রিয়তার সর্বোচ্চ নিরাপদ মাত্রা' নির্ধারণ করে দিয়েছে। মানুষের শরীরে এই নির্ধারিত পরিমাণের বেশি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটলে বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই তেজস্ক্রিয়তা কী? এবং এর উৎস কোথা থেকে? এটা জানার বিশেষ প্রয়োজন। তাই ঐ ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করছি পর্দার প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে।

তেজস্ক্রিয়া বিশেষ্য পদ এবং তেজস্ক্রিয় হল বিশেষণ পদ। সন্দি বিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় - তেজঃ + ক্রিয়া। এটি বিসর্গ সন্ধি। 'তেজঃ' শদ তিজ্ অস' ভাববাচ্য এবং কোনো কোনো সময় কর্তৃবাচ্য হয়। 'তেজঃ' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় বেশ কয়েকটি। কিন্তু এখানে যদি ভাববাচ্যের অর্থ নেওয়া যায় তবে কয়েকটির মধ্যে তীক্ষ্ণতা' এবং কৃর্তবাচ্যের অর্থ নিলে কয়েকটির মধ্যে 'অগ্নি', 'সূর্য' নেওয়া যায়। তবে তীক্ষ্ণতা, অগ্নি, সূর্য সবই কিন্তু একই ভাবার্থ, সমার্থক শব্দ। আর 'ক্রিয়া' শব্দের অর্থ 'কাজ'।

তাহলে এখানে 'তেজস্ক্রিয়' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'শক্তিশালী তাপ ছড়ানো কাজ অর্থাৎ শক্তিশালী তাপ বিকিরণ। এই তেজস্ক্রিয়তার যে বিকিরণ ঘটে তা প্রাকৃতিকভাবে মানুষ প্রতিনিয়তই নিজের অজান্তে তার শিকার হচ্ছে।

পদার্থ বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীরা বলেন, এই তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ৪টি প্রধান উৎস থেকে ঘটে চলেছে প্রাকৃতিক নিয়মে। যথা —

(১) পৃথিবীর বহিঃ আবরণ বা ভূত্বকে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে। ফলে ভূত্বক থেকে প্রতিনিয়ত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটে।

(২) মহাশূন্য থেকে আসা কসমিক রশ্মি তেজস্ক্রিয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

(৩) বায়ুমণ্ডলে অল্প পরিমাণে রেডন ও থ্রোন আছে যারা সামান্য পরিমাণে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করে।

(৪) মানুষের শরীরেও কিছু তেজস্ক্রিয় উপাদান আছে যেগুলো তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করে। যেমন পটাশিয়াম, কার্বন, রেডিয়াম ইত্যাদি।

উপরোক্ত ৪টি উৎস থেকে শুধুমাত্র মানুষের অর্থাৎ পুরুষের অণ্ডকোষ অথবা নারীর ডিম্বকোষ এর উপর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পরিমাণ নিম্নরূপ —

ভু-ত্বক থেকে ১-৩ মিলি Rad. কসমিক রশ্মি থেকে ০.৫ মিলি Rad, বায়ুমণ্ডল থেকে ০.০৫ মিলি Rad, শরীরের উপাদান থেকে ০.৫ মিলি Rad সর্বমোট ২-৪ মিলি Rad।

এই তেজস্ক্রিয়তার বাৎসরিক পরিমাণ দাঁড়ায় ০.১-০.২

Rads. [Rad তেজস্ক্রিয়তার একক]। ১ Rad হল ঐ পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা যা ১ গ্রাম টিসুর (Tissue) উপর ১০০x১০⁷ = ১০০০০০০০০০ কোটি গুণ শক্তি প্রয়োগ করে। তাহলে বাৎসরিক তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ১০-১২ কোটি গুণ শক্তি।

যেখানে মানুষ বিশেষ করে এই প্রধান ৪টি উৎস থেকে তেজস্ক্রিয়তার বিকিরণের শিকার হচ্ছে তাতে পর্দানাশীন নারীরা এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেন, নিরাপদে থাকেন। বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে পাওয়া তথ্য তাই বলে। কারণ মানুষের শরীর থেকে যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটে তার মধ্যে পটাশিয়াম নামক তেজস্ক্রিয়তা অন্যতম। ফলে ঐ পটাশিয়াম থেকে পুরুষদের চেয়ে নারীদের অনেক কম পরিমাণ বিকিরণ হয়। আর দ্বিতীয় কারণ হল, যেসব নারীরা ঘরের বাইরে বের হয় না বা বের হলে আপাদমস্তক আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে বের হন তাদেরকে অন্য ৩টি উৎসের তেজস্ক্রিয়তা আক্রমণ করতে পারে না। ফলে ঐ পর্দানাশীন নারীরা অবশ্যই নিরাপদে থাকবেন। কিন্তু পুরুষরা এবং পর্দাবিহীন নারীরা ঐ তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে পড়ে নিজেরা হোক কিংবা বংশগত ভাবে হোক উত্তরসূরী বংশধরেরা আক্রান্ত হতে বাধ্য হয়। International Commiittee on Radiation Protection 'তেজস্ক্রিয়তার সর্বোচ্চ নিরাপদ মাত্রা' নির্ধারণ করে দিয়েছে। তার থেকে বেশি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটলে বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

পর্দানাশীনা নারীরা যেহেতু এই তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে তাই তারা ঐ ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয় না। কিন্তু পুরুষরা সহ পর্দাহীনা নারীরা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়।

ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ায় কী ঘটতে পারে সে সম্পর্কে "Tutorial Pharmacy Cooper & Gunm, Pharmacology & Pharmocothermapeities, Satoskar, India" বলেছে যে, নিম্নলিখিত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়াগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। যথা —

(১) ত্বক লালচে হয়ে শুকিয়ে যায় এবং ঝরে পড়ে। Parmanent skin damage, Erythema dryness & brittleness of skin এমনকী ত্বকে ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। (২) Bone necrsis হাড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (৩) Anaemia রক্তাল্পতা হতে পারে। (৪) Leukaemia রক্তে ক্যানসার হতে পারে, (৫) Cromosome ক্রোমোজমগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (৬) Gene Mutation এর Frequency বৃদ্ধি পায়। (৭) Cataract চোখে ছানি পড়তে পারে। (৮) এর ফলে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অস্বাভাবিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, পর্দানাশীনা নারীরা কি তাহলে এই সব অসুখে ভুগে না? এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। কিন্তু জেনে রাখা ভালো যে, কোনো অসুখ একটি মাত্র কারণে হয় না। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে, 'একই অসুখ বিভিন্ন কারণে হতে পারে।' তবে পর্দানাশীনা নারীরা কিন্তু এই কারণে এই সব অসুখের সম্মুখীন হবে না ইনশাআল্লাহ্ অন্য কারণে হতে পারে। এতে আশ্চর্যের কিছুই থাকবে না।

ঐসব তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে যারা পতিত হবে তাদের জীবনেও ঐ ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে কিংবা তাদের উত্তরসূরী বংশধরেরাও ভুগতে পারে। ২/১ দিন কিংবা ২/১ মাসে মধ্যে ঘটতে পারে আবার ৫০ বছর পরেও প্রভাব ফেলতে পারে বংশগত ভাবে।

তাই আমাদের ভাবতে হবে যে, আল্লাহ্ ঐসব ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার স্রষ্টা, সেই আল্লাহ্ই আমাদের স্রষ্টা। তিনিই ভালো জানেন, কখন কী করলে মানুষ সুস্থ, সুন্দর, শান্ত পরিবেশে থাকবে। তাই তিনি এমন সূত্রযুক্ত সংবিধান প্রদান করেছেন যা শুনলে, জানলে, বুঝলে, প্রয়োগ করলে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া থেকে নিরাপদে থাকবে।

এইজন্যই আল্লাহ্র তৈরি করা গন্ডির মধ্যে, সীমারেখার মাঝে, সীমান্ত চৌহদ্দির বহিরাগত না হয়ে অবস্থান মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই সীমালঙ্ঘন করলেই বিপদ সংকুল পরিবেশে নিপতিত হয়ে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হবে।

নারী ও পুরুষকে আলাদা আলাদ প্রযুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। তাই দরকার আপন আপন প্রযুক্তির সীমারেখায় চলা। এটিই একান্ত কর্তব্য। ঐ সীমারেখাটি সূরা নুরের উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে আলোচিত হয়েছে। উভয়ের দৃষ্টি শক্তিকে ও যৌনাঙ্গগুলিকে নিজেদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখা ও নারীদের আকর্ষণীয় পোশাকের ব্যাপারে কঠোর সর্তকতা জারী করা হয়েছে। এই নিয়ন্ত্রণ রেখা ও সতর্কতা লঙ্ঘন করলেই সমূহ আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির স্বীকার হতে বাধ্য।

So, We should follow the Instruction of Allah and His last Prophet, Last Apostle, Last Messenger Mohammad (PBUH).

শিয়া-ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায় ঃ পরিচিতি ও আকীদা

অনুবাদ ও সংক্ষিপ্তকরণ ঃ আব্দুর রাকীব মাদানী

শিয়া-ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ বারো ইমামে বিশ্বাসী ইমামী শিয়া সম্প্রদায় এমন এক ফিরকার নাম যারা মনে করে যে, নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এরপর খেলাফতের উত্তরাধিকার হিসাবে আবু বাকর, উমার ও উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এর থেকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বেশি হকদার।

শিয়া কারা ?

এই প্রশ্নের উত্তরে তাদের শাইখ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন নুমান আল্ মুফীদ বলেন : যারা নিজেদেরকে আমীরুল মুমিনীন আলী (আলাইহিস্ সালাম) এর অনুসারী বলে দাবী করে। তারা মনে করে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ইন্তিকাল পরবর্তী প্রথম খলীফা হলেন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। এরা আলী (রাযিল্লাহু আনহু) এর পূর্বের খলীফাদেরকে অস্বীকার করে, আর পরোক্ষভাবে তারা নিজেদেরকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর অনুসারী মনে করে (ইসনা আশারিয়া শিয়াদের আকীদা, আব্দুর রহমান বিন সাআদ শাসারী, পৃঃ ২৬)।

এই শিয়াদেরকে ইমামী শিয়া বলা হয়, কারণ তারা ইমামতকে (নেতৃত্বকে) দ্বীনের মৌলিক বিষয় মনে করে। আর তাদেরকে ইসনা আশারী বলা হয়, কারণ তারা বারোজন ইমামকে বিশ্বাস করে, যাদের সর্বশেষ ইমাম সামুররা নামক স্থানের সুড়ঙ্গে (সিরদাবে) অবস্থান করছে। আহলুস সুন্নাহ্‌র বিপরীতে শিয়া বলতে এই মতবাদে বিশ্বাসীদেরকেই বুঝায়। বর্তমানে তারা মুসলিম বিশ্বে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিজস্ব মতবাদ প্রচারে সচেষ্ট।

তাদের ইমামগণ ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ববর্গ ঃ

যে বারোজন ব্যক্তিত্বকে শিয়া সম্প্রদায় ইমাম হিসাবে মনে করে তাদের ধারা পরম্পরা নিম্নরূপ :

১। আলী বিন আবী ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তারা তাঁকে 'মুরতাযা' উপাধি দিয়ে থাকে। তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের একজন এবং রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জামাতা। তাঁকে খারেজী আব্দুর রহমান বিন মুলজিম কুফার মসজিদে ১৭ই রমাযান ৪০ হিজরীতে হত্যা করে।

২। হাসান বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তাঁকে তারা 'মুজতাবা' উপাধি দিয়ে থাকে (৩-৫০ হিজরী)।

৩। হুসাইন বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তাঁকে তারা 'শাহীদ' উপাধি দিয়ে থাকে (৪-৬১ হিজরী)।

৪। আলী যায়নুল আবেদীন বিন হুসাইন। তাঁকে তারা 'সাজ্জাদ' উপাধি দিয়ে থাকে (৩৮-৯৫ হিজরী)।

৫। মুহাম্মদ আল বাকির বিন আলী যায়নুদ্দীন। তাঁকে তারা 'বাকির' উপাধি দিয়ে থাকে (৫৭-১১৪ হিজরী)।

৬। জা'ফার সাদিক বিন মুহাম্মদ আল বাকির। তাঁকে তারা 'সাদিক' উপাধি দিয়ে থাকে (৮৩-১৪৮ হিজরী)।

৭। মূসা আল কাযিম বিন জা'ফর। তাঁকে তারা 'কাযিম' উপাধি দিয়ে থাকে (১২৮-১৮৩ হিজরী)।

৮। আলী আর রেযা বিন মূসা কাযিম। তাঁকে তারা 'রিযা' উপাধি দিয়ে থাকে (১৪৮-২০৩ হিজরী)।

৯। মুহাম্মদ আল জাউয়াদ বিন আলী। তাঁকে তারা 'ত্বাক্বী' উপাধি দিয়ে থাকে (১৯৫-২২০ হিজরী)।

১০। আলী আল হাদী বিন মুহাম্মদ আল জাউয়াদ। তাঁকে তারা 'নাক্বী' উপাধি দিয়ে থাকে (২১২-২৫৪ হিজরী)।

১১। আল হাসান আল আসকারী বিন আলী। তাঁকে তারা 'যাকী' উপাধি দিয়ে থাকে (২৩২-২৬০ হিজরী)।

১২। মুহাম্মাদ আল মাহদী বিন হাসান আল আসকারী। তাঁকে আল হুজ্জাতুল কায়িম আল মুনতাজার (প্রতিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ) উপাধি দিয়ে থাকে (২৫৬ হিজরী)।

তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের দ্বাদশ ইমাম সামুররায় তার পিতার বাসার সুড়ঙ্গে (সিরদাবে) প্রবেশ করেছে অতঃপর আর ফিরেনি। আত্মগোপন করার সময় তার বয়স কত ছিল? এ নিয়ে তারা মতভেদ করেছে। কেউ কেউ বলেন, সেই সময় তার বয়স ছিল চার বছর, আর কেউ বলেন আট বছর। তবে বেশিরভাগ গবেষক বিষয়টিকে একটি ভ্রান্ত ধারণা মনে করেন এবং এটি শিয়াদের কল্পিত ঘটনা হিসাবে আখ্যা দেন।

তাদের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বগণ ঃ

১। তাদের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের অন্যতম হল আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা। যদিও শিয়াদের অনেকে এটা স্বীকার করে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তি ইয়েমেনের একজন ইহুদী ছিল। সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করার পর ইহুদী চিন্তা ধারা শিয়া মতবাদে অনুপ্রবেশ ঘটায়। উদাহরণ স্বরূপ সে শিয়াদের মধ্যে 'রাজআত' এর বিশ্বাস আমদানি করে। (রাজআত অর্থ ফিরে আসা)। তারা বিশ্বাস করে কেয়ামতের পূর্বে বারোতম ইমাম এবং কিছু মৃত ব্যক্তি পুনরায় তাদের পূর্বের আকারে পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং যারা শিয়াদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের বদলা নিবে।) সেই আমদানিকৃত বিশ্বাসগুলির একটি হল, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মৃত্যু বরণ না করার আক্বীদা। তাদের বিশ্বাস, তিনি সমগ্র জমিনের মালিক, এমন ক্ষমতার মালিক যার সমতূল্য ক্ষমতা সৃষ্টির আর অন্য কারও নেই এবং এমন জ্ঞানের অধিকারী যা অন্য কারো কাছে নেই। ইহুদী আক্বীদা থেকে আমদানিকৃত শিয়াদের আরেকটি আক্বীদা হল, 'বাদা' বিশ্বাস। (বাদা ইয়াবদু অর্থ : প্রকাশ পাওয়া। তারা বিশ্বাস করে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা আল্লাহ্ তাআলা তা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে জানতেন না — নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক)।

আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা ইহুদী থাকা অবস্থায় বলত — ইউশা বিন নূন হলেন নাবী মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এর অসিয়তকৃত প্রতিনিধি। অতঃপর ইসলাম প্রকাশের পর বলেছিল — আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হচ্ছেন নাবী মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর অসিয়তকৃত প্রতিনিধি। সে মদীনা, মিশর, কূফা বসরা ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করে এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলে, 'তুমি তুমি'। অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্। এ কারণে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে হত্যা না করার পরামর্শ দিলে তিনি তাকে মাদাইন এলাকায় বিতাড়িত করে দেন।

২। মানসূর আহমাদ বিন আবী ত্বালিব আত্ ত্বাবরুসী মৃত: ৫৮৮ হিজরী। কিতাবুল ইহতিজাজ-এর লেখক, যা ১৩০২ হিজরীতে ইরানে ছাপা হয়।

৩। কুলাইনী। কিতাবুল কাফী এর লেখক যা ইরানে ১২৭৮ হিজরীতে প্রকাশিত। এই গ্রন্থটির মর্যাদা তাদের নিকট তেমনই যেমন আহলুস সুন্নার নিকট বুখারীর মর্যাদা। তাদের মতে সেই গ্রন্থে ১৬১৯৯টি হাদীস রয়েছে।

৪। আলহাজ্জ মির্যা হুসাইন বিন মুহাম্মদ আন নূরী আত্ ত্বাবরূসী মৃত: ১৩২০ হিজরী। ইরাকের নাজাফে সমাধিত। ''ফাসলুল খিত্বাব ফী ইসবাতি তাহরীফি কিতাবি রাব্বিল আরবাব'' এর লেখক। সে মনে করে, বর্তমান কুরআনে কিছু কম-বেশি করা হয়েছে। তার মধ্যে সূরাতুল ইনশিরাহ্-এ একটি আয়াতের ঘাটতি রয়েছে, তা হল : ''ওয়া জাআলনা আলিয়্যান স্বাহরাক'' অর্থাৎ — ''এবং আমি আলীকে করেছি তোমার জামাতা।'' গ্রন্থটি ইরানে ১২৮৯ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে।

৫। আয়াতুল্লাহ্ আল মামক্বানী, ''তানক্বীহুল মাক্বাল ফী আহওয়ালির রিজাল'' গ্রন্থের লেখক। তাদের নিকট সে রিজাল শাস্ত্রের ইমাম হিসাবে স্বীকৃত। এই গ্রন্থেই সাহাবী আবূ বাকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কে 'জিবত' ও 'ত্বাগুত' বা শয়তান ও যাদুকর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে (দেখুন ১ম খণ্ড পৃঃ ২০৭)। গ্রন্থটি ১৩৫২ হিজরীতে নাজাফে প্রকাশিত।

৬। আবু জা'ফর আত্ তূসী লেখক : তাহযীবুল আহকাম।

৭। মুল্লা মুহসিন আলকাশী লেখক : কিতাবুল ওয়াফী।

৮। মুহাম্মদ বাকির মাজলেসী নামে প্রসিদ্ধ লেখক : বিহারুল আনওয়ার।

৯। আয়াতুল্লাহ্ আল্ খুমায়নী। আধুনিক যুগের শিয়া নেতা। আধুনিক ইরান বিপ্লবের নায়ক এবং বর্তমান ইরান ইসলামী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। তার প্রসিদ্ধ দুটি বইয়ের নাম হল, কাশফুল আসরার এবং আল্ হুকুমাহ্ আল্ ইসলামিয়াহ। এ খুমায়নী শিয়া মতবাদে সর্বপ্রথম (বেলায়াতুল্ ফক্বীহ) অর্থাৎ ইমামুল হুজ্জার অনুপস্থিতিতে ফকীহ ব্যক্তির ইমামত তথা নেতৃত্বের পক্ষে মত ব্যক্ত করে।

আকীদা ও চিন্তাধারা ঃ

১। ইমামাহ্ বা নেতৃত্ব : তাদের মতে নেতৃত্ব দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে। অর্থাৎ পূর্বের নেতা পরের নেতাকে নির্দিষ্টরূপে নির্ধারণ করবে; তার গুণাগুন বর্ণনার মাধ্যমে নয়। নেতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উম্মাতকে নেতৃত্বহীন অবস্থায় ছেড়ে মারা যাবেন তা হয় না; বরং তার জন্য কোনো এক ব্যক্তিকে নির্ধারণ করা জরুরী ছিল, যার দিকে পরবর্তী

লোকেরা প্রত্যাবর্তন করবে এবং তার প্রতি ভরসা করবে।

তারা এই বিষয়ে বলে থাকে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) 'গদীরে খুম' দিবসে স্পষ্টই আলীর ইমামত নির্দিষ্ট করে দিয়ে ঘোষণা করেন যে, তিনি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পরে ইমাম বা খলীফা হবেন। অবশ্য গদীরে খুম নামক ঘটনায় এমন নির্ধারণের বিষয়টি আহ্‌লে সুন্নাতের মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের নিকট অস্বীকৃত ও অসাব্যস্ত।

তারা মনে করে, আলী তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসাইনের নেতৃত্ব নির্ধারণ করেছিলেন। তাই প্রত্যেক ইমাম এভাবে তার পরের ইমামকে নির্ধারণ করবে আর এটা হবে তার অসীয়ত স্বরূপ। তারা তাদের 'আউস্বিয়া' (অসিয়তকৃত ব্যক্তিবর্গ) নামে আখ্যায়িত করে থাকে।

২। ইসমাত বা ইমামদের নিষ্পাপতায় বিশ্বাস : তাদের বিশ্বাস যে, তাদের সকল ইমাম ছোট-বড় সকল প্রকার পাপ থেকে পবিত্র এবং নিষ্পাপ।

৩। ইলমে লাদুন্নীর আক্বীদা (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) : তাদের প্রত্যেক ইমামকে ইলমে লাদুন্নী তথা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেওয়া হয়েছে যা দ্বারা তারা শরীয়ত পরিপূর্ণ করে থাকে। তারা ইলমে লাদুন্নীর অধিকারী। তাদের ও নাবীদের মধ্যে এছাড়া কোনো পার্থক্য নেই যে, নাবীদের কাছে অহী আসে আর তাদের কাছে অহী হয় না। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাদের শরীয়তের গোপন ভেদ দিয়ে গেছেন, যেন তারা সময়ের দাবী অনুযায়ী সাধারণ লোকদের বর্ণনা দেয়।

৪। ইমামের অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস : ইমামের হাতে অলৌকিক কিছু প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। এসবকে তারা মুজিযা বলে থাকে। যদি কোনো ক্ষেত্রে পূর্বের ইমাম পরের ইমামকে নির্ধারণ না করে থাকে তাহলে এমতাবস্থায় পরের ইমাম অলৌকিকতার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

৫। গায়েব বা অনুপস্থিতির আকীদা : তারা বিশ্বাস করে যে, কোনো যুগ হুজ্জাতুল্লাহ্ থেকে শূন্য হতে পারে না। এই বিশ্বাসের ফলস্বরূপ তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের বারোতম ইমাম তার সুড়ঙ্গে গায়েব হয়ে গেছে বা আত্মগোপন করেছে। তারা আবার এই বিষয়টিকে ছোট আত্মগোপন ও বড় আত্মগোপনে বিভক্ত করে থাকে, যা মূলতঃ তাদের কল্প-কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত।

৬। রাজআ'ত বা প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাস : তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের দ্বাদশ ইমাম হাসান আসকারী শেষ যামানায় পুনরায় ফিরে আসবে যখন আল্লাহ্ তাকে পাতাল কুঠরি থেকে বের হওয়ার আদেশ দিবেন। সে এসে জুলুম ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচারে ভরে দিবে এবং শিয়া বিরোধীদের বদলা নিবে।

৭। 'তাকিয়া' (গোপনীয়তা) নীতি অবলম্বন : তাকিয়া মানে গোপনীয়তা। তারা সওয়াবের কাজ মনে করে অন্তরের মূল বিশ্বাসকে গোপন করে শিয়া ছাড়া অন্যদের সামনে ভিন্ন মত প্রকাশ করে। এটাই তাকিয়া নীতি। তারা এমন করাকে দ্বীনের মৌলিক বিধান মনে করে এবং তাকিয়া পরিত্যাগ করাকে স্বলাত পরিত্যাগ করার মত পাপ মনে করে। তাদের শেষ ইমাম পৃথিবীতে পুনরায় আগমনের পূর্বে এই বিধান পালন করা ওয়াজিব। যে তার পূর্বে তা পরিত্যাগ করবে সে দ্বীন থেকে এবং ইমামিয়া মতবাদ থেকে বের হয়ে যাবে। তাদের পঞ্চম ইমাম আবু জাফরের বরাতে তারা উল্লেখ করেছে, ''তাকিয়া আমার দ্বীন এবং আমার পূর্ববর্তীদের দ্বীন, যার তাকিয়া নেই তার ঈমান নেই।''

৮। 'মুত্আহ্' করা (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কন্ট্রাক্ট বিবাহ করা) : তারা মহিলার সাথে মুতআহ সম্পর্ক করাকে উত্তম স্বভাব এবং অতি উত্তম নৈকট্যের কাজ মনে করে এবং এর স্বপক্ষে কুরআনের এই দলীল উপস্থাপন করে। ''অতঃপর তাদের মধ্যে যাদের তোমরা সম্ভোগ করেছো, তাদেরকে তাদের ধার্যকৃত মোহর প্রদান কর'' (সূরা নিসা, আয়াত নং ২৪)।

এই প্রকার বিবাহকে ইসলাম হারাম করেছে, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিছু বিনিময়ে করা হয়। অধিকাংশ আহলুস্ সুন্নাহ্ বিবাহে শর্তারোপ করেছেন যে, তা যেন অনির্দিষ্টকালের নিয়তে হয়। তাছাড়া মুতআহ্ বিবাহের রয়েছে কিছু সামাজিক কুপ্রভাব, যা তা নিষিদ্ধতার মতকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

৯। বর্তমান কুরআন ছাড়াও ফাতেমী মুসহাফ বা ফাতেমী কুরআন থাকার দাবী : তারা মনে করে, তাদের নিকট বর্তমান কুরআন ছাড়াও ফাতেমী মুসহাফ নামে অন্য একটি কুরআন রয়েছে। এ কথাটি কুলায়নী তার আল কাফী গ্রন্থের ৫৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, জাফর সাদেক থেকে বর্ণিত ''আমাদের নিকট রয়েছে ফাতেমী মুসহাফ। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, ফাতেমার মুসহাফ কী ? তিনি বললেন, তা এমন মুসহাফ (কুরআন)

যা তোমাদের এই কুরআনের তিনগুণ। আল্লাহ্‌র কসম তাতে তোমাদের কুরআনের একটি অক্ষরও নেই।"

১০। বারাআত বা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করা : তারা তিন খলীফা আবু বাকর, উমার এবং উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয় এবং তাঁদের জঘন্য বিশেষণে আখ্যায়িত করে। তারা মনে করে, উক্ত তিন ব্যক্তি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খেলাফত অবৈধ পন্থায় জবরদখলকারী। এই কারণে তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ না বলে আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এর প্রতি লানত (অভিশাপ) দেওয়ার মাধ্যমে শুরু করে। এছাড়াও তারা বহু সাহাবী এমনকী উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জঘন্য ভাষায় অভিশাপ দেয় এবং তাঁদের মান-সম্মানে আঘাত করে।

১১। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন : তাদের অনেকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে থাকে। অনেকে তাকে মাবুদের স্তরেও পৌঁছিয়েছে যেমন সাবাঈ শিয়ারা। তাদের অনেকে বলেছে যে, জিবরীল ফেরেশতা ভুল করে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পরিবর্তে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট রেসালাত নিয়ে অবতরণ করে, কারণ আলী দেখতে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মত ছিলেন যেমন কাক কাকের মত হয় এই জন্য তাঁকে তারা গুরাবিয়্যাহ (কাক সাদৃশ্য) নামকরণ করে।

১২। গদীরে খুম ঈদ-উৎসব পালন : তারা প্রতিবছর ১৮ই যুলহাজ্জ তারিখে এই ঈদ-উৎসব পালন করে। তারা এই ঈদকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা থেকে প্রাধান্য দেয় এবং ঈদুল আকবার (সবচেয়ে বড় ঈদ) আখ্যা দেয়। এই দিনে সিয়াম রাখা তাদের নিকট সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। তারা বিশ্বাস করে যে, এই দিনে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তার পরবর্তী খলীফা হিসাবে অসিয়ত করেছিলেন।

এছাড়া তাদের আরও একটি ঈদ রয়েছে যা তারা রবিউল আউয়াল মাসের নবম তারিখে উদ্‌যাপন করে। সেটা তাদের বাবা শুজাউদ্দীনের ঈদ। এটা প্রকৃতপক্ষে অগ্নীপূজক আবু লুলু-এর কবর। এই অগ্নীপূজক ছিল উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যাকারী।

১৩। শোক পালন : তারা শোক পালনের অনুষ্ঠান করে, মৃতকে স্মরণ করে বিলাপ করে কাঁদে, বুক চাপড়ায়, ধারাল অস্ত্র দ্বারা পিঠ আঘাত করে রক্তাক্ত করে। এই প্রকার কাজ তারা মুহাররম মাসের প্রথম দশকে সওয়াবের আশায় করে এবং পাপের কাফ্‌ফারা মনে করে। বর্তমানে যদি কেউ তাদের পবিত্র স্থানাদি যেমন কারবালা, নাজাফ, কুম ইত্যাদি এলাকা ভ্রমণ করে, তাহলে আরও অনেক আশ্চর্যজনক কার্যকলাপ দেখতে পাবে (অবশ্য তাদের এসব কার্যক্রম বর্তমানে নেট মারফতও দেখা যায়)।

উপরোক্ত আকীদা পোষণ করার পাশাপাশি তারা বিভিন্ন বড় শির্কে লিপ্ত। যেমন, আল্লাহ্ ছাড়া সৃষ্টির কাছে দুআ করা, তাদের নিকট আশা-ভরসা করা, তাদের জন্য নযর-মানত করা, সাজদা করা, তাওয়াফ করা প্রভৃতি।

তাদের বর্তমান অবস্থান ঃ বর্তমানে ইসনা আশারিয়া তথা ইমামিয়া শিয়াদের মূল অবস্থান হচ্ছে ইরান। এ দেশই হচ্ছে তাদের কেন্দ্রভূমি। এছাড়াও একটি বড় সংখ্যা রয়েছে ইরাকে এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। ভারতীয় উপমহাদেশ এবং আফ্রিকাতেও তাদের স্বল্প-বিস্তর উপস্থিতি রয়েছে।

সারাংশ : শিয়া মতবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে এ নিয়ে যে, আবু বকর, উমার ও উসমানের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তুলনায় আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খেলাফতের বেশি হকদার। অতঃপর ক্রমশঃ এই মতবাদ বৃদ্ধি লাভ করে এবং পরবর্তীতে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও আকীদাগত ফিরকায় পরিণত হয়, যার ঝাণ্ডা তলে ইসলাম ও মুসলিম শত্রুরা আশ্রয় নেয়। ইসলামের ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ণ করলে জানা যাবে যে, বৃহৎ মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিচ্ছিন্নতার প্রায় সকল আন্দোলনের পিছনে কোনো না কোনোরূপ শিয়া গোষ্ঠির হাত রয়েছে এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। তাদের নিজস্ব চিন্তা-ধারার কারণে শিয়া মতবাদ ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ একটি পৃথক ধর্মের রূপ নিয়েছে। এর ফলে ইসলাম শত্রু এবং পাশ্চাত্য সমাজ মুসলিম জাতিকে পারস্পারিক বিভেদ সৃষ্টিকারী দলে দলে বিভক্ত ধর্ম হিসাবে পেশ করার সুযোগ পাচ্ছে এবং সৃষ্ট মতবাদের সাথে তুলনা করছে, যাদের বিভিন্ন দল-উপদলের সংখ্যা শতাধিক ছাড়িয়ে গেছে।

মূলগ্রন্থ ঃ

ধর্ম, মতবাদ ও সমকালীন ফিরকা সংক্রান্ত সহজ বিশ্বকোষ

মহানাবীর জীবনে তায়েফ

মোহাম্মাদ জাকারিয়া

বৃহস্পতিবার ২০শে এপ্রিল ২০১৭ সাল। মক্কার কাস্‌রে আয়জাদ আল সাদ হোটেল হতে ৯৬২৮ EDA ০০২৪ (Higer) নং বাসখানা ছাড়ল। আমরা জনা ৭০ যাত্রী। গন্তব্যস্থল তায়েফ শহর। অতি সুন্দর সর্পিল পীচ রাস্তা বেয়ে গাড়ি ছুটছে ১ শত মাইল বেগে। অথবা তারও বেশি। কোনো হেলদোল নেই। মনে হচ্ছে যেন হোটেলেই রয়েছি। দু'পাশে পাহাড়ের Cavalcade চিত্রার্পিতের মত পেরিয়ে যাচ্ছে। মক্কা হতে ৫০/৬০ কিমি পেরিয়েছি। মাঝে মাঝে সমতল উপত্যকা। ফল ফসলের চাষ ও ফুলের বাগান। তায়েফের সীমানায় ঢুকছি।

ইসলামের ইতিহাসে একটা জ্বল জ্বলে নাম। বহু পিছনে ফেলে আসা ঘটনার সাক্ষী। পূণ্য স্মৃতিকে বুকে আঁকড়ে ধরে চির-জাগরূক। মনটা চলে গেল দেড় হাজার বছরের পিছনের সেই তায়েফে। শিশু নাবীর বাল্য জীবনের ভূমিতে বাসটা থামল ওয়াদি-এ-হালিমা পাহাড়ের ধারে।

হালিমার কবরের পাশেই খানিকটা পাথর ঘেরা জায়গা। মাঝে বেশ কয়েকখানা মুসাল্লা বিছানো। আমাদের গাইড মৌলানা নূর মুহাম্মাদ সাহেব কষে ধমক দিলেন, 'আপ লোগ কাহে হিঁয়া নামাজ পড় রাহে হ্যায়? ইয়ে বিলকুল বিদ্‌আত।' কে শোনো কার কথা। তারা পড়তেই থাকল। তাপমাত্রার পারদও তখন বেশ উঠে গেছে ৪০° ডিগ্রীর কাছাকাছি।

চান্দ্র মাস রবিউল আওয়াল। ১২, ৯, ১০, ৮ অথবা ২ তারিখ। সোমবার। দিনও নয়, রাতও নয়। সোবহ সাদেকের আলো আঁধারির শান্ত, শুভ্র, মনোরম আলোক রেখা গগন প্রান্তে উদ্ভাসিত। স্নিগ্ধ শীতল বায়ু প্রবাহে ধরাতল পুলকিত। এই অপরূপ মুহূর্তে আমিনার কুটির অপূর্ব নূরে উজালা। শিশুটি ভূমি স্পর্শকালে দু-হাত সাজদারত অবস্থায়। চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। যার শুভ্র নূর-জ্যোতির আলোকে পূর্ব-পশ্চিম সৃষ্টিজগত আলোকিত। প্রকম্পিত হল তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজশক্তি পারস্য সাম্রাজ্য ও রোম সাম্রাজ্য। কাফেরি শক্তির শৌর্য-বীর্যে ভাটার ইঙ্গিত।

সৃষ্টিকর্তা তাঁর জন্মের জন্য বিশ্বের বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান মক্কা নগরীকে নির্বাচন করেছিলেন। বিশ্বে যত নগর-নগরী আছে সে সবের মধ্যে এটা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে একে 'উম্মুল কোরা' বা সমস্ত নগর-নগরীর জননী বলা হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টিকালে আল্লাহ্ একে কেন্দ্র করেই ভূমণ্ডল সম্প্রসারিত করেন। এই সূত্রে এটা সকল নগরীর কেন্দ্র স্থল। বংশধারার দিক হতেও ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালালম) এর বংশধর। আবার কোরেশ বংশ সমগ্র আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বংশ।

মা আমিনার গর্ভকাল যখন ৬ মাস তখন স্বপ্ন দেখলেন — এক আগন্তুক যেন বলছে ''বিশ্বের সর্বোত্তম ব্যক্তিকে গর্ভে ধারণ করেছো। নাম রেখো মুহাম্মাদ।'' জন্মগ্রহণ করলেন মক্কার অভিজাত কোরেশ বংশে বানু হাশেম গোত্রে। জন্মের ৭ দিনে আব্দুল মেত্তালিব নবীজির খাতনা করালেন। অন্য মতে মবীজি জন্মগত ভাবেই খাতনাকৃত ছিলেন।

মানুষের ব্যক্তিগত চিহ্নের জন্য যেরূপ Distinctive Marks থাকে সেরূপ নাবীজির শরীরের পৃষ্ঠদেশে, বাম কাঁধের চওড়া হাড়ের মাথায় কবুতরের ডিমের মত একটি গুঁটলি ছিল। ওটাই মোহরে নবুওত। মোহরে নবুওত নাবীজির জন্মগত ছিল, নাকি পরে সৃষ্টি হয়েছিল সে ব্যাপারে মতভেদ আছে। ভূমিষ্ট হবার পর ৮/৯ দিন শিশু নাবী মা আমিনার দুধ পান করেছিলেন। অতঃপর আবু লাহাবের ক্রীতদাসী সুওয়াইবা কিছুদিন দুধ পান করিয়েছিলেন। এটা ছিল একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে আরবের প্রথা অনুযায়ী তায়েফ হতে সা'আদ গোত্রের একদল ধাত্রী মক্কায় পৌঁছেছিল। তাদের মধ্যে ভাগ্যবতী বিবি হালিমাও ছিলেন। ধাত্রী মহিলাগণ মুহাম্মাদ ইয়াতিম জেনে কেউই গ্রহণ করল না। কারণ তারা উত্তম বিনিময় পাবে না। হালিমার শীর্ণকায় দেহে দুধ কম ভেবে অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয় মানুষ তাকে শিশু দিতেও নারাজ। এমতাবস্থায় খালি হাতে ফিরে যাওয়া অপেক্ষা ঐ ইয়াতিম শিশুকে নেওয়া উত্তম বিবেচনা করে তিনি মুহাম্মাদকেই গ্রহণ করলেন। হালিমা শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে মক্কা হতে তায়েফ যাত্রা করলেন। হঠাৎ তার শীর্ণ যানবাহন গাধাটি অতি দ্রুতগামী হয়ে গেল। এখন সে সব যানবাহনের অগ্রগামী। সঙ্গীগণও অবাক। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের বর্ণনা।

হালিমা শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে তায়েফ পৌছালেন। দেশে তখন অনাবৃষ্টি ও অভাব। পশুর দুধ পর্যন্ত নেই। হালিমার পৌছানোর সাথে সাথে বকরীগুলির দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। অন্যদের বকরীতে দুধ নেই। একই স্থানে চরা সত্বেও অবস্থা এরূপ ছিল।

দু বছর পর সাধারণ নিয়মানুসারে হালিমা শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে তাঁর মাতা আমিনার কাছে নিয়ে গেলেন। মক্কায় তখন প্লেগের

প্রাদুর্ভাব। এই বাহানায় হালিমা আবার তাঁকে তায়েফে নিয়ে এলেন। হালিমার আন্তরিক ইচ্ছাও ফিরিয়ে আনার পক্ষে ছিল।

একদিন বালক মুহাম্মাদ ছাগল চরাচ্ছে তার দুধ ভাই এর সঙ্গে গৃহের নিকটবর্তী পাহাড়ের ধারে। তার দুধ ভাই দৌড়ে এসে তার মা ও বাবার কাছে বলল, আমার কোরায়শী ভাইটিকে সাদা পোষাক পরিহিত দু ব্যক্তি এসে তাকে ধরাশায়ী করে বুক ফেড়ে দিয়েছে। হালিমা ও তার স্বামী হারেস ছুটলেন। গিয়ে দেখেন মুহাম্মাদ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করায় বলল, আমাকে সাদা-পোশাক পরা দু' ব্যক্তি এসে শায়িত করে আমার বুক ফেড়ে কী যেন তালাশ করে বের করে দিয়েছে। আমি তা জ্ঞাত নই। হালিমার স্বামী হারেস বললেন যে, মনে হয় বালকটির উপর জ্বীনের আছর হয়েছে। আমরা এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ পাহাড়ে এসে হাজির। গাইড জানালেন যে, এই পাহাড়েই শিশু নাবীর বক্ষ বিদারণ করা হয়েছিল। আরও বর্ণনা করলেন হাদীসের কথা। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন — একদা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বাল্যাবস্থায় বালকদের সঙ্গে খেলায় মগ্ন ছিলেন। এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালালম) এসে তাকে শায়িত করে তার বুক চিরে তার হৃৎপিণ্ড হতে একটা জমাট মাংস পিণ্ড বের করে নিলেন। দেহের মধ্যে শয়তানের যে অংশ ছিল তা। তারপর জিবরাঈল ঐ হৃৎপিণ্ডটিকে সোনার প্লেটে রেখে জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে কাটা হৃৎপিণ্ডটি জোড়া লাগিয়ে দিলেন। যথা স্থানে পুনঃস্থাপন করলেন। আনাস আরও বলেন যে, নাবীজির বক্ষে আমি সেলাই-এর চিহ্ন দেখেছি (মুসলিম শরীফ)। ঘটনাটা ঘটে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম বছরে। তবে হালিমার ঘরে থাকার সময়।

ভূমিষ্ট হবার ৭ অথবা ৯ দিন পর্যন্ত মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্বীয় মাতা আমিনার দুধ পান করেছিলেন। অতঃপর আবু লাহাবের ক্রীতদাসী সোয়াইবাহ্ মাত্র কয়েকদিন দুধ পান করিয়েছিলেন। স্থায়ী ধাত্রীর অপেক্ষায় এটা অস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল। এরপর আরবের প্রথা অনুযায়ী সায়াদ গোত্রীয় ধাত্রী রমণীদের একটি দল মক্কায় পৌঁছিল। তাদের মধ্যে ভাগ্যবতী হালিমা ছিলেন। হালিমার দুধ শিশু মুহাম্মাদ পান করে। একটা লক্ষণীয় ব্যাপার যে মুহাম্মাদ কখনো দুটি স্তন হতে দুধ পান করতেন না। একটা স্তন হতেই করতেন। কেবল ডানের স্তন হতে। আর একটা স্তন দুধ বোনের জন্য রাখতেন। আল্লাহ্ তাআলা ভবিষ্যতে নাবী বানাবার জন্যই হয়ত বা তাঁর মধ্যে ইনসাফ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

১ম পর্ব

الافراط فی دعوی محبة ال البيب و جهود العلماء فی بیان الحق.

নাবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসায় সীমালংঘন এবং প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদানে ওলামাদের প্রয়াস

তাজাম্মুল হক সালাফী

(গত ১৬-১৮ই সেপ্টেম্বর জামিয়াতুল ইমাম বুখারী, কিশানগঞ্জ মাদ্রাসায় নাবী পরিবার ও সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দের বিষয়ে কাসীম বিশ্ববিদ্যালয় (মাক্কার) উদ্যোগে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেই কনফারেন্সে 'নাবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসায় সীমালংঘন এবং প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদানে ওলামাদের প্রয়াস' — প্রবন্ধটি লিখিতভাবে পেশ করা হয়।)

ان الحمد لله نحمده و نستعينه، من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادی له، وأسهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله، أما بعد

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَ نِسَاءً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَائَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

আল্লাহ্ তাআলা নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে (৬১/৯)। কিয়ামতের প্রাক মুহূর্তে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন শুভসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী (২/১১৯) এবং আল্লাহ্র প্রতি আহ্বানকারী হিসাবে (৩৩/৪৬)। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মাধ্যমে পথভ্রষ্টকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন, বধিরকে সত্য বাণী শুনিয়েছেন, অবুঝকে সত্য বাণী বোঝার সামর্থ দিয়েছেন এবং অন্ধকেও সত্য পথ দেখিয়েছেন। এভাবে তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রিসালাতের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন, আমানত মানুষের নিকটে পৌঁছে দিয়েছেন, উম্মাতকে সঠিক পরামর্শ দিয়েছেন এবং সর্বোপরি আল্লাহ্র রাস্তায় প্রকৃত সংগ্রাম করেছেন। তিনি আমাদেরকে দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট পথে রেখে গিয়েছেন। যাদের ধ্বংস অনিবার্য তারা ব্যতীত কেউই এ পথ হতে বিচ্যুত হবে না (ইবনু মাজাহ্ ৪৩, হাদীস সহীহ্)। সুতরাং নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যে দ্বীন আমাদের জন্য রেখে গেছেন, সেই দ্বীনের অনুসরণ ব্যতীত কেউই মুক্তি পেতে পারে না। আল্লাহ্ বলেন : বল, হে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)! যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অনুগ্রহশীল। বল, আল্লাহ্র আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রসূলের, যদি তোমরা বিমুখ হয়ে যাও, নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না (সূরা আল্ ইমরান, আয়াত নং ৩১-৩২)। রসূল তোমাদের যা দেন তোমরা তা গ্রহণ কর আর যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহ্কে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা (সূরা হাশর, আয়াত নং ৩)। আল্লাহ্র রসূল উম্মাতকে তাঁর অনুসরণ করতে আদেশ করেছেন এবং তাঁর বিরোধিতা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন : আমার নির্দেশ ব্যতীত যে আমলই করবে, সেই আমল প্রত্যাখ্যান করা হবে (বুখারী)। নাবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়াও তাঁর (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত।

আলে বায়ত বা নাবী পরিবার বলতে কী বোঝায়?

শাব্দিক অর্থ ঃ আলুর রাজুল অর্থাৎ আহলু বাইতিহি। যার অর্থ হল মানুষের পরিবার (মুজামু মাকাইয়িসুল লুগা ১/১৬১)। জাওহারি এবং ইবনু মুনযুরও একই অর্থ প্রকাশ করেছেন (শুযুরাতুয যাহাব ৩/১৪৩ এবং লিসানুল আরাব ১১/৩১)। আল শব্দটির আসল মাদ্দা হল আহল। কিন্তু হা বর্ণটি পরিবর্তিত হয়ে আলে পরিণত হয়েছে। যেমন কুরআনে রয়েছে আলে ফেরাউন, আলে ইমরান, আলে ইব্রাহীম (৩/৩৩, ৪০/৪৬)।

বাইত ঃ বাইতুর রাজুল অর্থাৎ মানুষের বাড়ি, ঘর বা বিল্ডিং (আন নেহায়া-ইবনু কাসীর)। বাইত মানে স্ত্রী (লিসানুল আরাব ২/১৫)। আলুল বাইত এবং আহলুল বাইত সমার্থক শব্দ। দুটোর অর্থ একই। কিন্তু আহ্লে বাইত বলতে আলুন নাবী বা নাবী পরিবারকেই বোঝানো হয়েছে (সুরাতুল আহযাব ৩৩)।

পারিভাষিক অর্থ ঃ নাবী পরিবারের সীমা নির্ধারণে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ বিষয়ে চারটি মতামত থাকলেও মূলত দুটি মত প্রাধান্যযোগ্য।

প্রথমত : যাঁদের উপর সাদকা হারাম — আবু হানীফা (ফাতহুল কাদীর লে ইবনে হুমাম ২/২৭৪, উমদাতুল কারী ৭/৩৩৯), শাফেয়ী (আল মাজমু লিন্ নওয়াবী ৩/৪৬৬), আহমাদ বিন হাম্বাল (মাজমাউল ফাতাওয়া লি ইবনে তাইমিয়া ২২/৪৬০) এবং কিছু মালিকীদের (আল্ মুনতাকা শারহু মুআত্তা ২/১৫৩) মত এটাই। দলীল : হাসান বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একবার সাদকার খেজুর খাবার জন্য মুখে দেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ফেলে দিতে বলেন এবং বলেন : তুমি কি জানো না যে, আমার জন্য সাদকা হালাল নয় (বুখারী ১৩৯৬ বাবু মা ইউযকারু ফিস সাদাকা ...., বুখারী ১৩৯০ বাবু আখযিস সাদাকাতিত তামার ......)? এবং বিখ্যাত হাদীসে 'গাদীরে খুম' এ রয়েছে যাঁদের উপর সাদকা হারাম তাঁরা আলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। আর তাঁরা হল আলে আলী, আলে আকীল, আলে জাফার এবং আলে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। সকলের প্রতিই সাদকা হারাম (মুসলিম ৪৪২৫ বাবু ফাযায়েলে আলী ইবনে আবী তালেব......)। এছাড়া এ সংক্রান্ত আরো অনেক হাদীস রয়েছে মুসলিম ১৭৮৪।

দ্বিতীয়ত ঃ আলুন নাবী হল তাঁর সন্তানাদি ও তাঁর স্ত্রীগণ আব্দুল বার ও ইবনুল আরাবী এবং শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (মাজমাউল ফাতাওয়া ২২/৪৬১)। দলীল ঃ সহীহ্ মুসলিমের হাদীস :

أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ

كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قُولُوا اللّٰهُمَّ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

এই হাদীসে স্পষ্টভাবে রয়েছে যে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিজের স্ত্রীদের উপরও দরূদ বা দুআ করার জন্য বলেছেন। নীচের এই হাদীসটি —

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مَحَمَّدٍ .

অর্থ ঃ ''হে আল্লাহ্‌! তুমি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও তাঁর আলের উপর শান্তি বর্ষণ কর'' আলে মুহাম্মাদের ব্যাখ্যা। সুতরাং নাবী পত্নীগণ নাবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত অনুসারীগণ তার পরিবারভুক্ত। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, সমস্ত মুত্তাকীরা তাঁর পরিবারভুক্ত। অবশ্য ইবনুল কাইইম (রহঃ) আলে বাইত বলতে আলী ও ফাতেমা এবং তাঁদের বংশধরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন — হুকুক আলে বাইত।

নাবী পরিবারের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা প্রদর্শনের শারয়ী মান ঃ আলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা রাখা মুসলিমদের জন্য ফরয। আল্লাহ্‌ বলেন, ''বল, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাদের নিকটে প্রতিদানে কেবল আমার নিকটাত্মীয়দের জন্য মুহাব্বত ও ভালোবাসা চাই'' (৪২/২৩)। আর নাবী পরিবারের প্রতি এই ভালোবাসা পরিবারের প্রধান অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জন্যই (হুকুক আলে বাইত - ইবনু কাইইম)। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আমার আহল বা পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে আমি তোমাদের আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি'' (মিশকাত ৬১৩১ হাদীস সহীহ্‌)। এ বিষয়ে আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ''কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আত্মীয়গণ আমার আত্মীয়দের থেকে আমার নিকটে বেশি প্রিয়'' (বুখারী ৩৪৩৫ বাবু মানাকেবে রসূলিল্লাহ্‌ ......, মুসলিম ৩৩০৪, বাবু কওলিন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম লা নুরাসূ মা তারাকনা ......)। সমস্ত সাহাবা কেরামগণ নাবী পরিবারের সদস্যদের প্রতি শরীয়ত প্রদত্ত সীমারেখার মধ্যে ভক্তি ও ভালোবাসা রাখতেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত সলফে সলেহীনগণও তাঁদের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা রাখবেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, নাবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসার নামে কিছু মানুষ বিশেষ করে শিয়া রাফেযীরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করে শরীয়তকে কলঙ্কিত করেছে, তাঁদের মর্যাদাহানি করেছে এবং সর্বোপরি তাঁদের প্রতি যুলুম করেছে।

ইফরাত বা সীমালংঘনের অর্থ ঃ ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীন। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন বা ধর্ম আল্লাহ্‌র নিকটে গৃহীত হবে না। আল্লাহ্‌ বলেন, ''যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন বা ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার দ্বীন গৃহীত হবে না'' (৩/৮৫)। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ্‌ তাআলা দ্বীন ইসলামকে পূর্ণ করে দিয়েছেন (৫/৩)। সুতরাং দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ দ্বীন। এতে সংযোজন বা বিয়োজনের কোনো অবকাশ নেই। ইফরাত হল ইসলামের বিধি বিধানে সীমালংঘন আর সেই মর্যাদার সীমা হ্রাস করা হল তাফরীত। এ প্রসঙ্গে আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ বলেন, ''তোমরা দ্বীনের বিষয়ে সীমালংঘন বা বাড়াবাড়ি করো না'' (৪/১৭১, ৫/৭৭)। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''হে মানুষ! তোমরা দ্বীনের বিষয়ে সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তীরা সীমালংঘনের কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে (নাসায়ী ৩০০৭, বাবু ইলতিকাতিস হাসা, সিলসিলাহ্‌ সহীহ্‌ ১২৮৩)।

মুহাব্বত বা ভালোবাসায় সীমালংঘনের অর্থ ঃ মুহাব্বত আরবী শব্দ। এর বাংলা প্রতিশব্দ হল ভালোবাসা ও ভক্তি। ভক্তি ও ভালোবাসা মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বা গুণ। সুতরাং কোনো বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা বা ভক্তি প্রদর্শন করা — বস্তু বা ব্যক্তির বাহ্যিক চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের কারণেই হোক অথবা আভ্যন্তরীণ গুণমানের জন্যই হোক, কোনো দোষের নয়। কিন্তু যখন এই ভালোবাসা ও ভক্তির সঙ্গে অন্ধত্বের অর্থাৎ সমস্ত প্রকার যুক্তি ও দলীলের উর্ধ্বে মনগড়া বা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে লোক দেখানো ভালোবাসার সংমিশ্রণ ঘটে, তখনই আমরা তাকে ভালোবাসায় সীমালংঘন বলি। সাহাবাগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) রসূলের প্রতি যে প্রেম ও ভালোবাসা দেখিয়েছেন তার নজির বিশ্বে বিরল। সেই মুহাব্বতই হল প্রকৃত মুহাব্বত। নাবীর প্রতি মুহাব্বত রাখা ফরয কিন্তু তাতে বাড়াবাড়ি করা হারাম। এ কারণে সাহাবীগণ রসূলের জন্য জান ও মাল বিলিয়ে দিলেও তাতে সীমালংঘন করে কখনো তাঁকে সাজদা করেন নি, তাঁকে মাবূদ ভাবেন নি এবং তাঁর কবরকে মাযারও বানান নি। পক্ষান্তরে অন্ধভক্তি ও ভালোবাসা দেখিয়ে খৃষ্টানরা ঈসা (আলাইহিস্‌ সালাম) কে আল্লাহ্‌র আসনে বসিয়েছে এবং তাঁকে তাঁর পুত্র বানিয়ে দিয়েছে

অথচ ঈসা (আল্লাইহিস্ সালাম) কখনো তাঁর হাওয়ারিদের একাজ করতে বলেন নি (৫/১১৬)। ইহুদিরা উযায়ের (আল্লাহ্হিস্ সালাম) কে আল্লাহ্র পুত্র নির্ধারণ করেছে। ঠিক এরকমই মুসলিম নামধারী কিছু মানুষ বিশেষ করে ইসনা আশারিয়া শিয়া রাফেযীরা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মুহাব্বতের সমস্ত সীমালংঘন করে নাবী পরিবারের প্রতি অন্ধভক্তি ও ভালোবাসার নামে তাদেরকে মাবূদ, নিষ্পাপ, অমর, মহা ক্ষমতার মালিক বানিয়ে দিয়েছে। ইসলামী সীমালংঘন করার ফলে ইসলামে বহু ফিরকার উদ্ভব হয়েছে। সীমালংঘনকারী ফিরকার মধ্যে একটি বিশেষ ফিরকা হল ইসনা আশারিয়া শিয়া রাফেযী যারা নাবী পরিবারের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসায় সীমালংঘন করে ইসলামী সংস্কৃতিতে অ-ইসলামী সংস্কতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ইসলামের সমূহ ক্ষতিসাধন করেছে।

নাবী পরিবারের প্রতি অতিভক্তি ও অন্ধ ভালোবাসা প্রদর্শনের পটভূমি ঃ মনে রাখতে হবে যে, উদ্দেশ্যবিহীন কোনো কর্মই সংঘটিত হয় না। আবার কোনো কাজ হঠাৎ করেও হয় না। যে কোনো কাজের পশ্চাতে থাকে এক পটভূমি। নাবী পরিবারের প্রতি অতিভক্তি ও অন্ধ ভালোবাসার নেপথ্যে রয়েছে এক সুপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত কুভাবনা। ইসলামের সূচনালগ্নেই যার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মদীনায় হিজরত করে আসার ফলে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের নেতা হওয়ার স্বপ্ন বিফল হয়। জন্ম নেয় তার মনে নাবীর প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ। বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেও মনে মনে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। তার হাত ধরেই জন্ম নিয়েছিল সাবায়ী মুনাফেকী দল। এই সাবায়ী দলই হল সেই অঙ্কুরিত বীজ। যারা সব সময়ই ইসলামের অমঙ্গল কামনা করত এবং ক্ষতি সাধনের সমস্ত পথ ও পদ্ধতির ব্যবহার করত। নাবীর জীবদ্দশায় এমনকী আবূ বাকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এর শাসনামলে তেমন কিছু করার সাহস না দেখালেও তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়নি। উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সময়ে নানা অজুহাতে তারা মাথা চাড়া দেয় এবং উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র সরলতার সুযোগ তাঁকে তারা হত্যা করে। অভিশপ্ত বিদ্রোহীরাই আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে খিলাফতের বাইআত নিতে বাধ্য করে। এরা তাঁকে নিজেদের মত করে পরিচালনা করার চেষ্টা করে। মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র সঙ্গে সন্ধি করতে এদেরই একটি দল আপত্তি করে বেরিয়ে যায়। যাদেরকে খারেজি বলে ইতিহাস পরিচয় দেয়। বাকীরা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র প্রতি অতি ভক্তি দেখায়। এরাই হল রাফেযী। এরা কুচক্রী ইহুদিদের হাতে গড়া দল। মনে রাখতে হবে যে, নাবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি প্রদর্শনের নামে সীমালংঘন ইহুদিদেরই চক্রান্তের ফসল।

নাবী পরিবারের প্রতি অতি ভক্তি ও অন্ধ ভালোবাসার সূত্রপাত ঃ ইসলামী খিলাফতের এ ডামাডোলের সুযোগে ভেকধারী মুসলিম ইয়ামেনী ইহুদি আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র প্রতি অতি ভক্তি দেখিয়ে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে সমস্ত সাহাবাদের উপর শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দেয় এবং

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى.

হে আলী ! তুমি আমার নিকটে হারুন (আলাইহিস্ সালাম) এর সমমর্যাদার (বুখারী ৩৪৩০)। এ হাদীসকে সামনে রেখে আলীই খেলাফতের প্রকৃত হকদার বলে প্রচার চালায় এবং দাবী করা হয় যে আলীই হলেন **রসূলের অসী** অর্থাৎ রসূলের মৃত্যুও পর আলীই খেলাফতের উত্তরাধিকার। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র সমর্থকরা সাবায়ীদের দাবীকে সমর্থন জানালে, নাবী পরিবারের প্রতি অতি ভক্তি ও অন্ধ ভালোবাসার দ্বার প্রশস্ত হল। সাবায়ীরা আরো দাবী করে যে, আলীই হলেন নাবী। এখানেই ক্ষান্ত থাকে নি আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা তো পরিস্কার বলল : হে আলী তুমিই হলে মাবূদ। আর অন্য একদল অন্ধভক্ত বলল : মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) পাঁচজনই হলেন মাবূদ। ধীরে ধীরে এ ভক্তি ও ভালোবাসার ক্ষেত্র প্রসারিত হল। পরিবর্তন হল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। কেবল আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কেই নয় বরং নাবী পরিবারের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের নামে তাঁর বংশের আরো ১১ জনকে তারা ইমামের মর্যাদায় ভূষিত করল। তাঁরা হলেন (১) হাসান বিন আলী (২) হোসাইন বিন আলী, (৩) আলী বিন হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), (৪) মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হোসাইন (আল বাক্বির), (৫) জাফর বিন মুহাম্মাদ (সাদিক্ব), (৬) মূসা বিন জাফর (আল্ কাযিম), (৭) আলী বিন মূসা (আররাযা), (৮) মুহাম্মাদ বিন আলী (আল্ জওয়াদ) (৯) আলী বিন মুহাম্মাদ (আলহাদী), (১০) আল হাসান বিন মুহাম্মাদ (আল্ আসকারী) এবং (১১) মুহাম্মাদ বিন আল হাসান (আল মাহদী)।

তামাকজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, ভক্ষণ, বিপণন ও পান করা হারাম

মহাম্মদ শব্দর আলি

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র বিশুদ্ধ দ্রব্যাদি খেতে বলেছেন, আর অপবিত্র নোংরা দ্রব্যাদি বর্জন করতে বলেছেন , '' পবিত্র জিনিস খাও এবং অপবিত্র জিনিস বর্জন কর '' (সূরা আ'রাফ আয়াত নং ১৫৭)। নোংরা অভ্যাস ও ধূমপান নিঃসন্দেহে খুব খারাপ ও ক্ষতিকারক, সেজন্য এগুলি হারাম। তামাক, জর্দা, খৈনী, বিড়ি, সিগারেট, গুল, হিরোইন, কোকেন প্রভৃতি স্পষ্টভাবে বা সরাসরি হারামের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই। সেইজন্য এগুলি হালাল কিংবা মাকরূহ (যা খেতে বাধা নেই) মনে করে কিছু মৌলভী খৈনী, গুল, জর্দা ইত্যাদি ব্যবহার করে। ফলে সাধারণ মানুষ মনে করে এগুলি শরীআত সম্মত ও খেতে বাধা নেই।

তামাক ও নেশা হারাম সে বিষয়ে কিছু হাদীস ঃ

আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেছেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, ''প্রত্যেক নেশাজাত দ্রব্য হারাম'' (সহীহুল জামেইস সাগীর হা/৪৫৫০, আর রওযুন নাযির হা/৫৪২, ৫৮৮)। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''মদ ও তামাক জাত দ্রব্যাদি হারাম'' (ফাতাওয়া রহমানী হা/৬৯৬৩, লাজনা দায়েমা হা/১৬০,১৫৫০)। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''মাদকতা আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তু মদ এবং প্রতিটি মাদক দ্রব্য হারাম'' (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তার অর্থাৎ তামাকের মধ্যে আরোগ্য রাখেন নি যা তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন'' (সহীহ্ ইবনে হিব্বান হা/১৩৯১, সিলসিলাহ্ সহীহাহ্ হা/১৬৩৩)। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''হে আমার প্রতিপালক ! হে আমার প্রভু ! কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় লেবাস হারাম এবং হারাম দ্বারায় তার পুষ্টি সাধন হয়েছে। অতএব তার দুআ কীভাবে কবুল হতে পারে? (মুসলিম হা/১০১৫, তিরমিযী হা/২৯৮৯)। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''হে কাব বিন উজরাহ্ যে মাংস হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হবে তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত'' (সহীহ্ তিরমিযী ৫০১, হাদীসটি ইমাম তিরমিযী কাব বিন উজরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণনা করেন)। তামাকজাত দ্রব্য হারাম তা উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তথাপি যারা ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণ, পান, উৎপাদন, বিপণন করবে তাদের পরিণতি কিয়ামতের দিনে ভয়াবহ হবে।

যারা এগুলিকে মাকরূহ বলে উৎপাদন, ভক্ষণ, পান, বিপণন করে তারা কি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উম্মত নয় যে তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অমান্য করে। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ''যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে অমান্য করবে, সে পথ ভ্রষ্ট হবে। (সূরা আহযাব ৩৬)। অর্থাৎ জাহান্নামে যাবে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তার প্রবৃত্তি আমার আনীত বিধানের অনুসারী না হয়ে যায়'' (শারহুস সুন্নাহ্, মিশকাত)। অতএব কুরআনে স্পষ্ট না থাকলেও আল্লাহ্ তাআলা নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মারফত সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তামাকজাত দ্রব্যাদি হারাম। স্নায়ু উত্তেজক যে কোনো দ্রব্য হারাম। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কথা মানে আল্লাহ্র কথা অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মারফত আমাদেরকে নির্দেশ, আদেশ দিয়েছেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''সে যা তোমাদেরকে দেয় তা গ্রহণ কর আর যা তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক '' (বুখারী ৫৯৩৯, মুসলিম ২১২৫, আবু দাউদ ৪১৬৯, তিরমিযী ২৭৮২, ইবনে মাজাহ্ ১৯৮৯)।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে কেউ এমন কোনো কাজ করল যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই তা পরিত্যাজ্য'' (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯৭৫৯, বুখারী হা/২৬৯৭, মুসলিম হা/১৭১৮, ইবনু মাজাহ্ ১৪, আবু দাউদ ৪৬০৬)। উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে আরো স্পষ্ট হল যে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বিধান মানে আল্লাহ্র বিধান। যে এই বিধান অবহেলা করে সীমালংঘন করবে তার স্থান হবে জাহান্নামে। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে বলেন, ''আর যে ব্যক্তি সীমালংঘন ও

জুলুম করবে, শীঘ্রই আমি তাঁকে আগুনে জ্বালাবো" (সূরা নিসা আয়াত নং ৩০)। তামাকজাত দ্রব্যাদি যারা ভক্ষণ, উৎপাদন, বিপণন, পান করে তাদের বুদ্ধি বিভ্রম ঘটে। তার জন্য তারা জ্ঞান থাকতেই জ্ঞানহীন। আল্লাহ্ বলেন, ''তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না" (সূরা বাক্বারাহ্, আয়াত নং ১৯৫)। তামাকজাত দ্রব্যের ন্যায় মানুষকে ধ্বংসে নিক্ষেপকারী বস্তু আর নেই। ওহে তামাকজাত দ্রব্যের সেবন, পান, উৎপাদন বিপণনকারী বন্ধু পালনকর্তার কঠোর বিধান মেনে উল্লিখিত জিনিসগুলি থেকে তওবা করে সুস্থ জীবনে ফিরে আসুন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''এটাই বিধান - যে আল্লাহ্র বিধানের মর্যাদা রক্ষা করে, তা তার রবের নিকট তার জন্য উত্তম" (সূরা হজ্জ্ব, আয়াত নং ৩০)।

লাভ ঃ সাময়িক আনন্দ পাওয়া যায়। গাঁটের পয়সা খরচ করে আল্লাহ্র দেওয়া সুস্থ শরীরকে অসুস্থ করে, মুখে দুর্গন্ধ আনয়ন করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''তাদের সুখ-সম্ভোগ ক্ষণস্থায়ী, তাদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি" (সূরা নাহ্ল, আয়াত নং ১১৫)। তাছাড়া তামাকজাত দ্রব্যাদি ভক্ষণ, পান করে পেট ভরে না, এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এটা মনের খোরাক জোগায়।

ক্ষতি ঃ (১) আর্থিক ক্ষতি : তামাক সেবনকারীরা তামাকজাত দ্রব্যাদি সেবন, ধূমপানে আর্থিক ক্ষতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। বছরে তারা হাজার হাজার টাকা খরচ করে নিজের শরীরের ক্ষতি করে। এর চেয়ে অজ্ঞতা আর পৃথিবীতে নেই। নিশ্চয় এগুলি অপচয়। আল্লাহ্ বলেন, ''তোমরা খাও পান কর অপচয় করো না" (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ৩১)। কুরআনে সূরা বানী ইসরাঈলের ১৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।" অর্থাৎ তামাকজাত দ্রব্যাদি যারা ব্যবহার করবে তারা শয়তানের অনুসারী। কোটি কোটি টাকা স্রেফ ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়।

(২) আধ্যাত্মিক ক্ষতি : জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''প্রত্যেক নেশাগ্রস্ত জিনিসই হারাম এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা অঙ্গীকার করেছেন, যে ব্যক্তি নেশাজাত দ্রব্য পান করবে, তাকে জাহান্নামের পুঁজ ও ঘাম পান করাবেন" (মুখতাসার সহীহ্ মুসলিম হা/২২৬৪, সহীহুল জামেইস সাগীর হা/৪৫৫১)। এছাড়া উপরোল্লিখত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তামাকজাত দ্রব্যাদি হারাম।

(৩) নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি ঃ ধূমপায়ীদের ধূমপানের সময় প্রতিটি টানই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। সেই সময় নিকোটিন বর্ণহীন পদার্থ ফুসফুসে ঢুকে মারণ রোগ গল নালীর ক্যান্সার ও ফুসফুস ফোলা, হৃদরোগ, স্মৃতিশক্তি লোপ, কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কার্বো-মনো-অক্সাইড নামে বিষাক্ত উপাদান শরীরে প্রবেশ করে বিষন্নতা সৃষ্টি করে, মানসিক ক্লান্তি, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি রোগ হয়। অ্যামোনিয়া উপাদানের দ্বারা ধূমপায়ীদের কাশি রোগ সৃষ্টি করে। এছাড়া যক্ষা, ব্রঙ্কাইটিস, হার্ট এ্যাটার্ক, মুখ গহ্বরের ক্যান্সার, যৌন ক্ষমতা হ্রাস, চর্মরোগ, বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম দান ইত্যাদি বহুবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যার চিকিৎসা দুরূহ। ধূমপায়ীদের দাঁড়ি, গোঁফ, আঙ্গুল হলুদ ও ময়লাযুক্ত দাঁত, দুর্গন্ধ যুক্ত মুখ ও শরীর। কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে যায়।

(৪) অন্যের স্বাস্থ্যের ক্ষতি : চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, ধূমপায়ীরা নিজের স্ত্রীসহ সন্তানাদি, সহযাত্রী, বন্ধু-বান্ধব পাড়া-প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয় ও ক্ষতি করে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়" (বুখারী হা/৬০১৮)। ধূমপায়ীরা নিজের স্বাস্থ্যের যেমন ক্ষতি করে তেমনি অধূমপায়ীদের সমানভাবে ক্ষতি করে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং অন্যের ক্ষতি করো না " (ইবনু মাজাহ্ ২৩৪০, মিশকাত হা/২৭৬২)।

(৫) মানসিক ক্ষতি : তামাকজাত দ্রব্যাদি ভক্ষণ ও পানের ফলে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমে, অলসতা, স্মরণশক্তি হ্রাস পায়, খিটমিটে মেজাজ, স্নেহ, ভালবাসা কমে যায়।

(৬) সামাজিক : যেহেতু তামাকজাত দ্রব্যাদি প্রকাশ্যে খাওয়া হয় না তার ফলে শ্রদ্ধাভাজনেষু ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা কমে যায়, ছোটদের প্রতি স্নেহ কমে যায়। অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ অপরাধ জগতে ঢুকে পড়ে। এরা সর্বদা মানুষের ঘৃণা কুড়ায় ও সমাজে নিগৃহীত হয়।

তামাক উৎপাদন ও বিপণন ঃ তামাক গাছ মাদকতা সৃষ্টিকারী গাছ। পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে। এ গাছ মাটির কিছু খাদ্য উপাদান নষ্ট করে। ফলে অন্য ফসলের ভাল উৎপাদন

হয় না। তামাক গাছ ছাগল, কুকুর ও শুকরে খাই না অথচ পৃথিবীর শ্রেষ্ট জীব হয়েও মানুষ খায়। তামাক থেকে তৈরি খৈনী, গাঁজা, গুল, বিড়ি, সিগারেট, গুটখা, হিরোইন, কোকেন, জর্দা ইত্যাদি এমন এক খাদ্য যা ক্ষুধা মেটায় না ও পুষ্টি জোগায় না, যা কেবল জাহান্নামের খাদ্যের সাথে তুলনীয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''যা তাদের পুষ্টি করে না, ক্ষুধা নিবারণ করে না" (সূরা গাশিয়া, আয়াত নং ৭)। সূরা আ'রাফের ১৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, ''তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে বৈধ, অপবিত্র বস্তুসমূহকে অবৈধ করেছেন।" অর্থাৎ সকল প্রকার নাপাক জিনিসকে আল্লাহ্ তাআলা হারাম করেছেন। অতএব তামাকজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, তৈরি, ব্যবসা, ভক্ষণ, পান ইত্যাদি হারাম। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''নেক কাজে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর, গোনাহ্র কাজে সহযোগিতা কর না " (সূরা মায়েদা, আয়াত নং ২)। তামাকজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন, ভক্ষণ, পান, চাষ-আবাদ ইত্যাদি করা থেকে তওবা করতে হবে, নচেৎ ক্ষতিগ্রস্তদের দলে পড়ে যাবেন। তামাকজাত দ্রব্যাদির ব্যবসা থেকে উর্পাজিত অর্থ হারাম। এই টাকায় মঙ্গল নেই বরং জাহান্নামে যাওয়ার চাবিকাঠি। মহান নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''এমন ব্যক্তির মাংস জান্নাতে যাবে না যা হারাম খেয়ে সৃষ্টি হয়েছে। আর যে দেহ হারাম হতে সৃষ্ট জাহান্নাম তার বেশি অধিকারী" (আহমাদ, সহীহ্) এই হারাম সম্পদ দান করলে দুআ কবুল হবে না। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''নিশ্চয় আলাহ্ তাআলা পবিত্র, তিনি পাক পবিত্র বস্তুই কবুল করেন" (সহীহ্ মুসলিম)।

সুতরাং মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনে তাঁর প্রতি আস্থা মজবুত করে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, খৈনি, গুল, গাঁজা, কোকেন, হিরোইন ইত্যাদির উৎপাদন বিপণন, ভক্ষণ, পান, চাষ আবাদ দয়া করে বন্ধ করুন। রুযির মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''যে কেউ আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পথ করে দেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে জীবিকা দান কবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট" (সূরা ত্বালাক আয়াত নং, ২-৩)। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো কিছু ত্যাগ করবে, মহান আল্লাহ্ তাকে তার অপেক্ষা উত্তম প্রতিদান দেবেন "(মুসনাদ, আহমাদ : ২০৭৩৯, সনদ সহীহ্)। আল্লাহ্র উপর আস্থা ও ভরসা রেখে তামাকজাত দ্রব্যাদি চাষ, উৎপাদন, ভক্ষণ, পান ইত্যাদি দয়া করে বন্ধ করুন। হালাল সম্পদ যতই অল্প হোক তা প্রচুর, হারাম সম্পদ থেকে উত্তম ও অধিক, বরকতপূর্ণ ও উপকারী। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''হে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তুমি বলে দাও, পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব হে জ্ঞানীগণ আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক যেন তোমরা সফলকাম হও" (সূরা মায়েদা, আয়াত নং ১০০)। খারাপ ও ভাল কোনোদিন এক হতে পারে না ও তার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে কম হলেও ভালোই জিতবে। অপবিত্র খারাপের কারণে বরকত শেষ হয়ে যাবে। যে জিনিসে পবিত্রতা ও কল্যাণ নিহিত তার উপকারীতা ও বরকত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''হে ঈমানদারগণ ! পবিত্র বস্তু যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম করে দিও না। সীমালংঘন করো না অবশ্যই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না" (সূরা মায়েদা, আয়াত নং ৮৭)। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যখন আল্লাহ্ কোনো জিনিস হারাম করেন তখন তা বিক্রি করা হারাম" (হিব্বান ৪৯৩৮, হাদীস সহীহ্)।

কুঅভ্যাস ত্যাগ ঃ কোনো কোনো কুঅভ্যাসকারী বন্ধু বলে, এই কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে পারি না। আবার কেউ কেউ বলে, ধূমপান না করলে পায়খানা পরিস্কার হয় না ইত্যাদি অজুহাত দেখায়। তাদের আমি বলব, এটা স্রেফ ধোঁকা দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়। যদি আল্লাহ্ সহায় থাকেন তবে এমন কোনো কাজ নেই যা মানুষ পারে না। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''আর মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে" (সূরা নাজম ৩৯)। চেষ্টা করলে সফল হবে ইন্শাআল্লাহ্। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''সমস্ত নেশাগ্রস্ত জিনিস থেকে বেঁচে থাকো " (সহীহাহ্ হা/৮৮৬, সহীহ্ জামে সাগীর হা/১৪৭-১৪৮)। যে সব জিনিস আল্লাহ্ তাআলা মুসলিমদের জন্য হারাম করেছেন সেগুলো আমরা খেলে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে পড়ে যাব। কোনো মুসলিমকে শুকরের মাংস খেতে বললে খাবে না; কারণ এটা হারাম। তদরূপ তামাকজাত দ্রব্যাদি হারাম। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''প্রত্যেক তামাকজাত দ্রব্য নেশাকর, প্রত্যেক নেশাকর বস্তু হারাম" (সহীহ্ মুসলিম হা/২০০৩)। অতএব

শুকরের মাংস যেমন মুসলিমদের নিকট হারাম তদরূপ হারাম তামাকজাত দ্রব্যাদি মুসলিমরা খাবে কেন ? হারামকে হারাম ভেবে তামাকজাত দ্রব্যাদি ভক্ষণ, সেবন, পান করা ত্যাগ করা যেতে পারে। তবে দীর্ঘদিনের অভ্যাস পরিত্যাগ করতে প্রথম প্রথম কষ্ট হলেও আমি জোর গলায় বলতে পারি তামাকজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার ত্যাগ করা যাবে ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান মেনে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করে স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য যে কোনো জিনিস ত্যাগ করা যায়। আসুন আল্লাহ্র প্রশংসা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করে এই নোংরা কুঅভ্যাস ও ধ্বংসাত্মক বিষপান ত্যাগ করে সুস্থ ইসলামিক জীবন গড়ে তুলি।

প্রতিরোধ ঃ প্রথম শুরু হয় কুস্বভাবের সাথীদের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে। পতঙ্গ যেমন দলে দলে আগুনের মনোহারী বলে আত্মবিস্মৃত হয়ে আত্মাহুতি দেয়। তেমনি দুনিয়ার হাজার হাজার মানুষ আপাত ঃ সুখ প্রাপ্তির মোহে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আত্মধ্বংস খেলায় মেতে এই মৃত্যু ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। সে পথ থেকে সে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না। গোটা পৃথিবীতে সরকারী উদ্যোগে তামাক উৎপাদন, বিপণন বন্ধ করে মূলে কুঠারাঘাত করলে অবশ্যই কমবে।

এই মহাব্যাধির প্রতিরোধের উপায় মূলত দুই ভাবে করা যেতে পারে।

(১) নৈতিক : নৈতিক প্রতিরোধকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা। মাতা-পিতা, শিক্ষক ও বয়স্ক গুরুজনের উপদেশের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যেতে পারে। (খ) ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা। এটা হল এ রোগের প্রধান চিকিৎসা। একমাত্র আল্লাহ্ ভীরুতাই মানুষকে সৎপথে আনতে পারে। জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভয় ও আখেরাতে জবাবদিহিতা মানুষকে আত্মধ্বংসী বিষপান থেকে মুক্ত করতে পারে।

(২) প্রশাসনিক প্রতিরোধ : নৈতিক চিকিৎসার সাথে প্রশাসনিক প্রতিরোধ অবশ্যই দরকার। এটাকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিরোধ হিসাবে ভাগ করা হয়।

(ক) রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ : রাষ্ট্রীয় দিক থেকে তামাকজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, তৈরি, চাষ-আবাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে জনগণের চেতনা জাগিয়ে, তামাকজাত দ্রব্যাদি আমদানী, রপ্তানি বন্ধ করতে হবে। তার সাথে সাথে তামাকজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, ভক্ষণ, পান, সেবন তৈরি বহন, বিপণনের প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে।

(খ) সামাজিক প্রতিরোধ : মানুষ সামাজিক জীব তাকে সমাজে বসবাস করতে হয়। এই কুঅভ্যাসকারীকে ঘৃণা করে তাদেরকে সামাজিক বয়কট করতে হবে। লোক চক্ষুর ভয়ে হয়তো এই নোংরা কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে পারে। পরিবারের লোক, প্রতিবেশীরা, সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকজন সবাই এক সঙ্গে তাঁকে ঘৃণা ও সামাজিক বয়কটের ভয় দেখালেও তার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, বিয়ে, চলাফেরা ইত্যাদি যাবতীয় কাজকর্ম বন্ধ করলে হয়তো সে তওবা করে মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারে। মুসলিমদের তওবা করার মোক্ষম সুযোগ হল রমাযান মাস। সূর্য উদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহ্র ভয়ে দিনে হালাল খাবার খায় না। সেই আল্লাহ্র ভয়ে ঐ তামাক জাত দ্রব্যাদি ভক্ষণ, পান, সেবন, চুষন প্রভৃতি পরিহার করতে পারে। আল্লাহ্ বলেন, ''গুরুতর নিষিদ্ধ কর্ম হতে বিরত থাকলে লঘুতর পাপগুলো আমি মোচন করবো ও সম্মানিত স্থানে দাখিল করবো'' (সূরা নিসা, আয়াত নং ৩১)।

৩। অন্যান্য উপায় ঃ (ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তামাক বিরোধী বিষয় পাঠক্রমে এনে পাঠ দান করতে হবে। (খ) চিকিৎসকগণ উপরোক্ত কুঅভ্যাসগুলির ক্ষতিকারক দিকগুলো তুলে ধরলে নোংরা অভ্যাস ত্যাগ করবে। (গ) আলেম ও খতিবগণ শুক্রবারের খুতবায় তামাকজাত দ্রব্যাদির অপকারিতা ও পরকালীন শাস্তির কথা তুলে ধরলে দ্রুত সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যে সমস্ত লেখক / লেখিকাগণ সরল পথ পত্রিকায় লেখা পাঠাতে চান তারা এই ই-মেল sfprintersbld@gmail.com এ লেখা পাঠিয়ে এই 9434531957 নম্বরে অবশ্যই ফোন করে জানাবেন।

মানব সৃষ্টির রহস্য

মহঃ সাদ্দাম হোসেন

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেন —

وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ .

স্মরণ কর যখন তোমাদের প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তান সন্ততি বাহির করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন ঃ আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই ? তারা বলে ঃ নিশ্চয়ই আমরা সাক্ষী রইলাম। (এ স্বীকৃতি গ্রহণ) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে জানতাম না' (সূরা আরাফ, ১৭২)।

উক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ জানিয়ে দেন যে, তিনি আমাদের রব (প্রভু) কি না এই জিজ্ঞাসা করা হলে আমরা সকলেই তাঁকে আমাদের রব হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছিলাম। এটি হেদায়াতের সর্বপ্রথম ব্যবস্থাপনা।

সৃষ্টির সূচনায় গৃহীত এই প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা পরবর্তীতে মানুষ ভুলে না যায় এ জন্য প্রথম 'মানুষ' আদমকে তাঁর বংশধরগণের হেদায়াতের জন্য প্রথম 'নাবী' হিসাবে প্রেরণ করেন (সূরা বাক্বারাহ্ ৩৮-৩৯)। এইভাবে আদম (আলাইহিস্ সালাম) হতে শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পর্যন্ত ৩১৫ জন রসূল সহ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর প্রেরিত হন (আহমাদ, ত্বাবারানী, মিশকাত হা ৫৭৩৭, সিলসিলাহ্ সহীহাহ্ হাঃ ২৬৬৮)।

এ কারণে আমাদের সকলের উচিত প্রেরিত নাবী রসূলদেরকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা। কিন্তু আফসোস অনেকেই করছে তার উল্টো। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে—

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ.

অর্থ ঃ আফসোস, বান্দাদের জন্য। যখনই তাদের কাছে কোনো রসূল এসেছে তখনই তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে (সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৩০)।

আমাদের এরূপ পদস্খলনের মূল কারণ পার্থিব সম্পদের প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে নিজের জন্মতত্ত্ব ও মৃত্যু রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা না করা। এ কারণেই আল্লাহ্ অহংকারী মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন —

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থ ঃ মানুষ কী দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে ? অতঃপর সে হয়ে গেল প্রকাশ্যে বিতন্ডাকারী (সূরা ইয়াসীন ৩৬/৭৭)। তাই মানুষের জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষনার্থে এই প্রবন্ধ রচনার ক্ষুদ্র প্রয়াস। অতএব আসুন আমরা আমাদের মোহাসক্ত হৃদয়কে সত্যাগ্রহী হওয়ার জন্য সম্বোধন করি, যেভাবে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার মোহাচ্ছন্ন মনকে সম্বোধন করে বলেছেন —

''জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধুপানে যায়,
ফিরায় কেমন ?
রে প্রমত্ত মন মম কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবে রে কবে ?
জীবন উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম ভাতি
কত দিন রবে ?''

এখন কুরআনে বর্ণিত মানব সৃষ্টির রহস্যের বৈজ্ঞানিক সত্যতা নিয়ে আলোচনা করব ইন্‌শা-আল্লাহ্।

আল্লাহ্ বলেন —

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۝ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝

অর্থ ঃ স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন তোমরা প্রভু ফেরেশতাদের বলেন, আমি মিশ্রিত পচা-কাদার শুকনো মাটি দিয়ে 'মানুষ' সৃষ্টি করব। অতঃপর যখন আমি তার অবয়ব পূর্ণভাবে তৈরি করব ও তাতে আমি আমার রূহ ফুঁকে দেব তখন তোমরা তার প্রতি সাজদায় পড়ে যাবে (সূরা হিজর ৫/২৮-২৯)।

অন্যত্র তিনি বলেন —

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে আকার-আকৃতি দান করেছেন যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি মহা পরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞানী (সূরা আল্ ইমরান ৩/৬)।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে মানুষ সৃষ্টির যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলির তালিকা নিম্নরূপ ঃ—

১। বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম মানব মাটি থেকে সৃষ্ট।

২। অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে মাতৃগর্ভে মানুষের সৃষ্টি।

১। মানুষ মাটি থেকে সৃষ্ট ঃ—

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে, মাটির সকল সার নির্যাস একত্রিত করে আঠালো ও পোড়া মাটির ন্যায় মাটির তৈরি সুন্দরতম অবয়বে আত্মা ফুঁকে দিয়ে আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করেছেন (২৩:১২, সাফ্ফাত ৩৮:১১, রহমান ৫৫:১৪)।

পর্যালোচনা ঃ মৃত্তিকাজাত সকল প্রাণীর জীবনের প্রথম ও মূল একক হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) যাকে বলা হয় আদি প্রাণসত্ত্বা। এ থেকেই সকল প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য বিজ্ঞানী ডঃ মরিস বুকাইল একে Bomb Cell বলে অভিহীত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে মাটির সকল প্রকারের রাসায়নিক উপাদান।

প্রায় ৭০-৭৫ কিলোগ্রাম ওজন বিশিষ্ট মানবদেহে উপস্থিত বিভিন্ন রসায়নিক পদার্থ সমূহের তালিকা নিম্নরূপ ঃ—

উপাদান	সংকেত	শতাংশ (%)	ওজন (গ্রাম)
অক্সিজেন	O	65.0	43,000
কার্বন	C	18.5	12,000
সিলিকন	Si	0.05	30
নাইট্রোজেন	N	3.3	2000
হাইড্রোজেন	H	9.5	6,300
ম্যাগনেশিয়াম	Mg	0.05	35
সালফার	S	0.25	150
সোডিয়াম	Na	0.15	90
পটাশিয়াম	K	0.35	225
ক্লোরিন	Cl	0.15	100
ক্যালসিয়াম	Ca	1.5	1,100
ফসফরাস	P	1.0	750
আয়রণ	Fe	0.01	4200
জিঙ্ক	Zn	0.01	2400
কপার	Cu	0.01	90
ম্যাঙ্গানিজ	Mn	0.01	13
ক্রোমিয়াম	Cr	0.01	6
মোলিবোডিয়াম	Mo	0.01	8
আয়োডিন	I	0.01	15
কোবাল্ট	CO	0.01	20

মানবদেহে এই সমস্ত পদার্থের উপস্থিতি প্রকটভাবে প্রমাণ করে যে মানুষ মাটি থেকে সৃষ্ট। এসব তথ্য বিজ্ঞান জানিয়েছে সবেমাত্র কিন্তু কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে আজ থেকে প্রায় ১৪৫০ বছর আগে। কাজেই মাটি থেকে সৃষ্ট জীবের স্বীয় স্রষ্টার পরিচিতি অর্জন ও তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করে মাটির প্রকৃতি বহাল রাখা উচিৎ। মাটির প্রকৃতি হল (১) উৎপাদন অর্থাৎ স্রষ্টার পরিচিতি অর্জন, (২) নিম্নগমন অর্থাৎ স্রষ্টার নিকট আত্মসমর্পণ ও অহংকার বর্জন।

হে আল্লাহ্ আমাদের সুমতি দাও।

১ম পর্ব

নাবী যুগে নারীদের দাওয়াত কার্যের রূপরেখা

সম্পাদনা - ড. সুলাইমান বিন হাম্দ আল্ আওদাহ্
ভাষান্তর ঃ আব্দুল হালিম বুখারী

প্রথম অধ্যায়
মহা নাবীর যুগে নারীদের দাওয়াতের ক্ষেত্রসমূহ

যাঁরা মহা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগের নারীদের দাওয়াতের রূপরেখা নিয়ে পর্যালোচনা করেন তাঁরা ভালোভাবে জানেন যে, তাঁদের দাওয়াতের ক্ষেত্রগুলি কত বিস্তৃত। তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে :

প্রথম অনুচ্ছেদ
নারী এবং স্বামীর সঙ্গে তাঁর দাওয়াত কার্য

১। সান্ত্বনা ও স্থিরিকরণ ঃ এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হলেন দায়ীদের অগ্রদূত ও আদর্শ এবং খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন প্রথম মুমিনা ও আহ্বায়ক। তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যেমন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন[১], তিনি (খাদিজা) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সঙ্গে থাকতেন এবং আল্লাহ্র যতদিন ইচ্ছা ছিল দুজনেই লুকিয়ে লুকিয়ে স্বলাত প্রতিষ্ঠা করতেন; এমনই বর্ণনা করেছেন যুহ্রী (রহঃ)।[২]

যখন দাওয়াতের কাজে দুঃখ-যন্ত্রণা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তখন দায়ীর প্রয়োজন হয় সান্ত্বনা ও প্রবোধের। খাদিজার (রাযিয়াল্লাহু আনহা) স্বীয় স্বামী প্রিয়তম মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সান্ত্বনা প্রদানে কার্যকরী ভূমিকা ও ইতিবাচক প্রভাব ছিল। কেমন হতে পারে প্রকৃত সান্ত্বনা প্রদান, বিষয়ের দৃঢ়ীকরণ, সংকল্পের বলিষ্ঠকরণ ? মহিয়সী নারী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে কঠিনতম অবস্থায় আপন করে নিয়েছিলেন, তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, শান্ত করেছিলেন, এটা সেই সময়ের ঘটনা যখন তাঁর প্রতি প্রথম অহী (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হয়েছিল।

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক অহী অবতীর্ণ এবং খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর অবস্থানের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে গেলাম। খাদিজার নিকট গিয়ে তাঁর উরুতে ভর দিয়ে বসে পড়লাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : ''হে আবুল্ কাসিম ! আপনি কোথায় ছিলেন ? আল্লাহ্র শপথ, আমি আপনার খোঁজে আমার দূতদের পাঠিয়েছিলাম। এমনকী তারা মক্কা হয়ে আমার কাছে ফিরে এসেছে। অতঃপর আমি যা কিছু দেখেছিলাম তাকে বললাম। তিনি বললেন : শান্ত হোন, হে আমার চাচাতো ভাই ! এবং স্থির থাকুন। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে রয়েছে খাদিজার প্রাণ, আশা করি আপনি এই উম্মতের নাবী হবেন''[১] তাঁর উপর মুশরিকদের পক্ষ হতে যে দুঃখ-যন্ত্রণা আসত তিনি (খাদিজা) সেগুলো প্রতিহত করতেন, তাঁকে স্থির করতেন, তাঁর সত্যায়ণ করতেন এবং জাতির দিক থেকে তাঁর উপর যে বিপদ অবতীর্ণ হতো তা হালকা করতেন — এমনই বিবরণ দিয়েছেন ইবনে আব্দুল বার।[২]

এই হচ্ছে স্বামীর খেয়াল রাখা ''আমি আপনার খোঁজে আমার দূতদের পাঠিয়েছিলাম'', আবার দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট কিংবা অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় সান্ত্বনা প্রদান ও স্থিরীকরণ। তাঁর বাক্যগুলির প্রতি দৃষ্টি দিন 'প্রসন্ন হোন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুন', কীভাবে তিনি সান্ত্বনা বাক্য ও স্থিরীকরণকে একত্রিত করেছেন। দেখুন, দায়ীদের কতই না প্রয়োজন এই ধরণের নারীর ! কত উদারমনা সেই নারী যে দাওয়াতি কাজে দুঃখ-যন্ত্রণার সময় তার স্বামীর সঙ্গ দেয় এবং সহযোগী, সহায়ক এবং আশ্রয় ও প্রবোধ দানের মাধ্যম হয়।

১। ত্বাবাকাত ৮/১৭, একথাই বলেছেন ক্বাতাদাহ্, যুহ্রি, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন উক্বাইল, ইবনে ইসহাক এবং আরও একাংশ বিদ্বান। তাঁরা তাঁর পূর্বে কাউকেই ব্যত্যয় করেন (আল্ ইস্তীআব ৪/১৮১৯)।
২। পূর্বোক্ত ৮/১৭।

১। সীরাত ইবনে হিশাম, তাহক্বীক : হুমাম ও সুআইলীক ১/২০১।
২। অল্ ইস্তীআব ৪/১৮২০।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মধ্যে যে ভীতি সঞ্চারিত হয়েছিল আপনি তা কল্পনা করতে পারেন। আপনি বুখারীর বর্ণনা পড়ুন, মহা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সান্ত্বনা প্রদানের আরও বিবরণ আপনি পাবেন। সেই সময় তিনি তাঁর সৎ চরিত্র ও উন্নত আচার-আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন যা ভীতি দূর করে দিতে পারে এবং বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে। অহী অবতরণের পর রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) খাদিজার নিকট ফিরে আসছেন। ওই সময় তাঁর হৃদয় প্রকম্পিত। তিনি বলছেন : ''আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।'' তাঁরা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভীতি দূর হলো এবং খাদিজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললেন। তিনি বললেন, '' আমার জীবনের ভয় হচ্ছে।'' তিনি (খাদিজা) দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, ''একদম না, আল্লাহ্র শপথ! তিনি আপনাকে কখনোই অপদস্ত করবেন না, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেন, বোঝা বহন করেন, বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করেন, আতিথেয়তা করেন এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন।''[১]

এই বাক্যগুলি উচ্চারিত হয়েছিল অজ্ঞতা ও উপেক্ষার মরুভূমিতে। এতে ছিল প্রতিরোধ ও প্রত্যাখ্যানের পূর্বাভাস। সেটা ছিল আরোগ্যকর মলম। এইভাবে দায়ী যখনই দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে প্রতিরোধ ও উপেক্ষার সম্মুখবর্তী হয় তখন তার জন্য তার নিকটতম ব্যক্তির সান্ত্বনা যথেষ্ট কার্যকরী হয়। তার দাওয়াতের প্রতি নিকটতম ব্যক্তিদের ঈমান তাকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এসব ছাড়াও ভবিষ্যতের ভীতি লাঘব করেছেন এবং দাওয়াত ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদির প্রতি ক্ষমতা ও সহায়ক চরিত্রের প্রশংসা করছেন।

এর পর বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই যে, মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর ভালোবাসার ঘোষণা করছেন ''আমাকে তার ভালোবাসা দান করা হয়েছে।''[২] তিনি তাঁর মাহাত্ম্য, অগ্রগামিতা ও সহায়তার কথা স্বীকার করছেন ''যখন মানুষ আমাকে অস্বীকার করেছিল সে আমাকে বিশ্বাস করেছিল, মানুষ যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল সে আমাকে সত্য বলে মেনেছিল..।''[৩]

১। বুখারী, অধ্যায় : অহীর সূচনা।
২। সহীহ্ মুসলিম, হাঃ ২৪৩৫।
৩। মুসনাদে আহমাদ (আল্ ফাতহুর রব্বানী ২০/২৪০); হায়সামি বলেন : এর সনদটি সহীহ্ (মাজমাউয্ যাওয়াইদ ৯/২২৭)।

২। নারীর অবিচলতা, যদিও স্বামী পথভ্রষ্ট হয় ঃ প্রকৃত ঈমান, বিপদ ও উৎকণ্ঠার সময় অবিচলতা একটি অন্যতম ভালো গুণ কারণ। নারী যখন ঈমান ও সত্যের আহ্বানে স্বামীর সঙ্গ দিচ্ছে তখন তার প্রশংসা করা হচ্ছে। কিন্তু তখন কী হবে যখন স্ত্রী তো ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু স্বামী তার বিরোধী?

এখানে নারীর তিনটি অবস্থানের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে এবং উভয়ের প্রশংসা করা হচ্ছে :

প্রথম অবস্থানটি গ্রহণ করেছিলেন উম্মে সুলাইম রুমাইসা (তাঁকে রুমাইসা, সাহ্লা ও রুমাইলা[১] বিনতে মিল্হান বলা হতো) তাঁর স্বামী মালিক ইবনে নায্র-এর সঙ্গে উম্মে সুলাইম ইসলাম গ্রহণ করেন, এমন সময় যখন তাঁর স্বামী বাইরে (সফরে) ছিলেন। তিনি ঘরে ফিরে তাঁর ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, তুমি কি বেদ্বীন হয়ে গেছো? তিনি বললেন : আমি বেদ্বীন হইনি, বরং আমি এই মানুষটির প্রতি ঈমান এনেছি।[২]

যেভাবে তাঁর স্বামী প্রত্যাখ্যান করলেন, ঠিক সেভাবে তিনিও বেদ্বীন হওয়ার ব্যাপারটিকে অস্বীকার করলেন এবং ঈমান সম্পন্ন বলিষ্ঠ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, ''বরং আমি এই মানুষটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।''

এটা এমন পরিবেশে বলা হচ্ছে যা পরিচিত গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়াকে স্বাবওয়াহ্ (স্বধর্ম ত্যাগ) বলে মনে করে। এই বিষয়টি আবার স্বামীর সঙ্গে, যে নারীকে শাস্তি দিতে সর্বাপেক্ষা সক্ষম। সুব্হানাল্লাহ্! উম্মে সুলাইম নারীদের সত্যের উপর অবিচল থাকার শিক্ষা দিচ্ছেন, যদিও স্বামী বিরোধিতা করে।

দ্বিতীয় অবস্থানটি গ্রহণ করেছিলেন হিওয়া বিনতে ইয়াযিদ বিন সিনান আন্সারি। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তা তাঁর স্বামী কায়স বিন খাতীম শায়ি'র কাছে গোপন রেখেছিলেন। তিনি তাঁকে স্বলাত আদায় করতে দেখলে তাঁর কাপড়গুলো নিয়ে তাঁর মাথার উপর রেখে দিতেন। আর বলতেন, তুমি এমন একটি ধর্ম পালন করছো যে সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। অতঃপর তিনি মক্কা এলেন। মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর ইসলাম এবং স্বামীর নিকট হতে তাঁর প্রাপ্ত আচরণ

১। ইবনে সা'দ : আত্ ত্বাবাকাত ৮/৪২৪।
৩। প্রাগুক্ত ৮/৪২৫।

সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁকে তাঁর স্ত্রী থেকে বিরত থাকার আদেশ দিলেন মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কায়সকে তাঁর সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন দ্বিতীয় আকাবায় (আল্ইসাবা)। ইবনে ইসহাক সীরাত ইত্যাদির মধ্যে বিষয়টি তাঁর দিকে ইশারা করেছেন।

নিশ্চয় এটা ইসলামের জন্য প্রবাসজীবন, উপহাস ও কষ্টে ধৈর্যধারণ আর তার শুভ পরিণাম এবং আল্লাহ্ ভীতির প্রমাণ ।

তৃতীয় অবস্থান গ্রহণ করছিলেন উম্মে হাবিবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর স্বামী উবাইদুল্লাহ্ বিন জাহ্শের সঙ্গে। এটা হলো বলিষ্ঠতম পদক্ষেপ। তিনি স্বামীর সঙ্গে হিজরতের দ্বিতীয় পর্বে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। সে (ইবনে জাহ্শ) ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আবিসিনিয়ায় মারা গিয়েছিল। আর উম্মে হাবিবা স্বীয় ইসলাম ধর্ম ও হিজরতের উপর অবিচল ছিলেন। ইবনে সা'দ তেমনটাই বর্ণনা করেছেন।[১]

এখন আমরা উম্মে হাবিবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বিবরণ শুনব স্বামীর সঙ্গে তাঁর কী ঘটনা ঘটেছিল। তিনি বলেন : আমি স্বপ্নে আমার স্বামী উবাইদুল্লাহ্ জাহ্শকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও কুৎসিত আকারে দেখলাম। আমি ভয় পেলাম। আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ ! তার অবস্থা বদলে গেছে। সকালে সে বলল, হে উম্মে হাবিবা ! আমি ধর্ম নিয়ে চিন্তাভাবনা করলাম। কিন্তু খ্রিষ্টধর্ম হতে উত্তম কোনো ধর্ম পেলাম না। আমি সেই ধর্মেরই অবলম্বী ছিলাম। তারপর মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ধর্মে প্রবেশ করেছিলাম, আবার খ্রিষ্টধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছি। আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ ! তোমার মঙ্গল নেই। আমি তাকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম, কিন্তু সে তার তোয়াক্কা করল না। পরিশেষে মদে বিভোর থেকে মারা গেল।[২]

একইভাবে নারী অবিচলতায় নমুনা তৈরি হতে পারে, এমনকী যদি তার নিকটতম ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। যদি তার পিতা আবু সুফিয়ান কুফরের নেতৃবর্গের অন্যতম। সেই যুগে - তবুও। সেই মহিলার মধ্যে একত্রিত হয়ে গিয়েছিল একাকীত্ব (আবিসিনিয়ার ভূমিতে), স্বামীর ইসলাম ত্যাগ এবং পিতা ও পরিবারের বিরোধিতা। এতদ্সত্বেও তিনি ধৈর্যধারণ করেন, অবিচল থাকেন এবং নিজেকে পুরস্কারপ্রাপ্তির যোগ্য করে তোলেন। তারপরেই হয়তো তাঁর সঙ্গে মহা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বিবাহ ছিল তাঁর অবিচলতার প্রতিদান ও তাঁর নীতির মূল্যায়ণ।

৩। সত্যের প্রতি স্বামীকে আহ্বান ঃ মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে মহিলাগণ স্বামীর বিরোধিতা সত্বেও সত্যের প্রতি অবিচল থেকেই ক্ষান্ত থাকেন নি, বরং তাঁকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছেন। হয়তো স্বামী প্রথমে মুসলিম ছিলেন, পরে ইসলাম ত্যাগ করেন - যেমন উম্মে হাবিবার পূর্বোক্ত ঘটনায় দেখা গেছে, যেখানে তিনি তাকে তার ইসলাম ত্যাগ করার অশুভ পরিণতির সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, ''আল্লাহ্র শপথ, তোমার কল্যাণ নেই'', অতঃপর তাঁর স্বপ্নের বিবরণ দিয়ে ভীতিপ্রদর্শন করেছিলেন, শুধু এই আশায় যে হয়তো তিনি ফিরে আসবেন, কিন্তু সব ব্যর্থ-ইতিপূর্বে এর আলোচনা হয়েছে।

কিংবা স্বামী মুশরিক ছিল এবং তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি। ফলে স্ত্রী তাঁর ইসলাম ও জাহান্নাম হতে পরিত্রাণের মাধ্যম হয়েছে। এই নীতিই উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ক্ষেত্রে উল্লেখিত হয়েছে যা তিনি তাঁর অপর স্বামী আবু তালহার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি (আবু তালহা) তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ওই সময় তিনি মুশরিক ছিলেন। তিনি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, লক্ষ্য করো এই পাথরটির প্রতি তুমি যার উপাসনা করো, অথচ সে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং তোমার কোনো উপকারেও আসে না, অথবা কাঠটিকে দেখো যেটি নিয়ে এসেছে একজন কাঠমিস্ত্রী এবং তোমার জন্য তৈরি করেছে। সেটা কি তোমার ক্ষতি করতে পারে? তোমার কোনো উপকারে আসে? তিনি বললেন : তাঁর কথা তাঁর মনে স্থান করে নিল এবং তিনি ঈমান নিয়ে এলেন এবং তাঁর কথা তাঁর মনে স্থান করে নিল এবং তিনি ঈমান নিয়ে এলেন এবং তাঁর মোহরানা ছিল ইসলাম।[১] অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি

১। আত ত্বাবাকাত ৮/৯৬।

২। আত্ ত্বাবাকাত ৮/৯৭; হাকিম আল মুসতাদরাকের (৪/২০, ২২) মধ্যে ঘটনাটি নিয়ে এসেছেন। যাহাবি তালখীসের মধ্যে এ বিষয়ে নীরব থেকেছেন এবং সিয়ারের (২/২২১) মধ্যে সেটিকে মুনকার বলেছেন।

১। ত্বাবাকাত ৮/৪২৬; ইমাম নাসায়ী বিবাহ অধ্যায়ে ইসলামের বিনিময়ে বিবাহ অনুচ্ছেদে (৬/১১৪) উল্লেখ করেন। ইবনে সা'দের রাবীগণ সিকা (বিশ্বস্ত)। নাসায়ীর সনদটি সহীহ্। প্রণিধান করুন : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/৩০৫; ইবনে

আবু তালহাকে বলেছিলেন, তোমার লজ্জা করে না তুমি একটি কাঠের সামনে সাজদা করো যা উৎপাদিত হয় ভূমি থেকে এবং সেটা বানিয়েছে অমুক সম্প্রদায়ের একজন হাবশী? তিনি বলেছিলেন, তুমি সাক্ষ্য দিচ্ছো যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল এবং আমি নিজেকে তোমার বিবাহের সূত্রে বেঁধে দিই? এছাড়া আমি তোমার কাছে আর কোনো মোহরানা চাই না। তিনি তাঁকে বললেন, আমাকে ভাবতে দাও। তিনি বলেন, তিনি গিয়ে চিন্তাভাবনা করলেন এবং এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল। তিনি বললেন, হে আনাস! তুমি দাঁড়াও এবং আবু তালহার সঙ্গে আমার বিবাহ পড়িয়ে দাও।[১]

'স্বামীকে স্ত্রীর আহ্বান'-এ একটি সতর্কবাণী, শিক্ষণীয় বিষয় ও মহা নাবীর নির্দেশিকা রয়েছে। যদিও উল্লেখ করা হচ্ছে স্ত্রী স্বামীকে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করছেন এবং স্বামীকে সদুপদেশ দেওয়ার যে চেষ্টা সাধনা করছেন তার প্রশংসা করা হচ্ছে, কিন্তু এই আহ্বানের পদ্ধতি যেন এমন না হয় যাতে স্বামী ক্রুব্ধ হয়ে যায় এবং গালাগালির পর্যায়ে পৌঁছে যায়; যার ফলে কল্যাণ অকল্যাণের রূপ ধারণ করবে। অনেক সময় পাপ পূণ্যের উপর ভারী হয়ে যায়; কারণ স্বামীর ক্রোধ সাংঘাতিক জিনিস আর দাওয়াতের উদ্দেশ্য তো কল্যাণের বাস্তবায়ণ ও সত্য প্রতিষ্ঠা। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তো দূরেই থাক, তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও শয়তানের কর্ম এবং দাওয়াত হলো প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দান।

সুতরাং স্ত্রীকে তা পরিহার করে চলতে হবে, যদিও স্বামী তার কোনো দুর্বলতার কারণে অথবা কোনো অজুহাতে কোনো ইবাদতকার্যে অবহেলা করে। তার অনুমতি নেই এমন যে কোনো নফল কার্যের জন্য উত্তেজিত করার ব্যাপারে তাকে সতর্ক থাকতে হবে কিংবা তার (স্ত্রীর) অভিযোগ থাকে যে সে তাকে আনুগত্যে বাধা দেয় - অনেক সময় তার আনুগত্য তার জন্য প্রথমে জরুরি হয়।

এই সব মর্মস্পর্শী বক্তব্যের প্রেক্ষিতে স্বাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে যেখানে তিনি তাঁর (ইবনে মুয়াত্তাল) অভিযোগ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট করেছিলেন। ঘটনাটি কী ছিল? তাঁকে সজাগ করার জন্য মহা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নির্দেশিকাই বা কী ছিল?

ইমাম আবু দাউদ সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন, আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : জনৈকা মহিলা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট আগমন করে এবং সেই সময়ে আমরাও তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে (মহিলা) বলে, হে রসূলুল্লাহ্! যখন আমি স্বলাত পড়ি তখন আমার স্বামী সাফওয়ান ইবনু মুয়াত্তাল আমাকে মারধর করে। আর আমি সিয়াম রাখলে সে আমাকে সিয়াম ভঙ্গ করায়। অথচ সে সূর্যোদয়ের পূর্বে কখনও ফজরের স্বলাত পড়ে না। রাবী বলেন, সাফওয়ান তাঁর নিকট উপস্থিত ছিল। রাবী বলেন, তিনি তার নিকট উক্ত মহিলার অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, হে রসূলুল্লাহ্! তার বক্তব্য, 'আমাকে মারধর করে, যখন আমি স্বলাত আদায় করি'। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সে এত (দীর্ঘ) দুটি সূরা (স্বলাতের মধ্যে) পড়ে, যা পড়তে তাকে আমি নিষেধ করি। রাবী বলেন, তিনি ইরশাদ করেন, যদি কেউ (ছোট) একটি সূরা পড়ে, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। আর তার বক্তব্য, ''আমি সিয়াম রাখলে সে আমাকে ইফতার করতে বাধ্য করে।'' ব্যাপার এই যে, সে সবসময়ই (নফল) সিয়াম রাখে। আর আমি যুবক হওয়ার কারণে(স্ত্রী সহবাস ব্যতীত) থাকতে পারি না। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আজ হতে কোনো স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতি ছাড়া (নফল) সিয়াম রাখবে না। আর তার বক্তব্য যে, আমি সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজরের) স্বলাত আদায় করি না। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আমরা পানি সরবরাহকারী পরিবারের লোক। রাতের প্রথমভাগে কাজ করি, শেষ রাতে ঘুমাই এবং এটাই আমাদের অভ্যাস। এজন্য আমরা সূর্যোদয় হওয়া ব্যতীত নিদ্রা হতে জাগতে পারি না। তিনি বলেন, তুমি যখনই নিদ্রা হতে জাগ্রত হবে, তখনই স্বলাত পড়ে নিবে।[১]

দাওয়াতের ক্ষেত্রে মহিলাদের এই বোধ রাখতে হবে যে,

হাজার আল্ ইসাবা (১২/২২৭) এর মধ্যে বলেন : এই হাদীসটির একাধিক সূত্র বিদ্যমান।

১। ইবনে সা'দ : আত্ ত্বাবাকাত ৮/৪২৭।

১। সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায় : সওম, অনুচ্ছেদ : স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর সিয়াম রাখা, ইবনে হাজার আল্ ইসাবা' এর মধ্যে হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন এবং যারা দুর্বল বলেছেন তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। দেখুন আল্ ইসালা ৫/১৫৩।

অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয়গুলির প্রতি তাকে প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে। স্বামীর প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়ণ করতে হবে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত আশু প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি পূরণের প্রতি গভীর দৃষ্টি দিতে হবে। শুধু এটাই গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, স্বামীকে দাওয়াত দিতে হবে ফলাফল যাই হোক না কেন। বরং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো সৎকর্ম ও সদুপদেশ গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করা, বিশেষ করে নফল কার্যসমূহে এবং সুন্নাতি কথা ও কর্মে।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে (সাধারণভাবে) নারীদের এই বিষয়টি বুঝতে হবে এবং বিশেষ করে স্বামীর ক্ষেত্রে, এতে উত্তম ফলাফল অর্জিত হবে এবং দূরীভূত হবে অশুভ পরিণতি।

৪। অর্থ দিয়ে স্বামীর পৃষ্ঠপোষকতা ঃ যেহেতু জীবনের জন্য অর্থ অত্যন্ত জরুরী, তাই দাওয়াত অব্যাহত রাখার জন্য অর্থের প্রয়োজন। প্রিয় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে মুসলিম নারীগণ এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। পবিত্র অর্থ সৎ পুরুষ বা নারীর জন্য কতই না উত্তম। নারীর বিবাহের মোহরানা সেই অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

যখন ইসলামের প্রধান নারী খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর দিকে ফিরে তাকাই তখন দেখতে পাই যে, তিনি মহা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতি অর্থ দিয়ে সহমর্মিতা দেখিয়েছিলেন। আর তিনি অর্থশালী মহিলা ছিলেন। তিনি ব্যবসা করতেন এবং মজুরি দিয়ে অন্যদের ব্যবসায় প্রেরণ করতেন। মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে খাদিজার ব্যবসাসূত্রে সিরিয়া গিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি বিত্তবান নারী ছিলেন তাই যখন প্রিয় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে বিবাহ করলেন। তিনি এই অর্থ আল্লাহ্ তাআলার পথে এবং দ্বীনের দাওয়াতের সেবায় উৎসর্গ করে দেন। মহা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এই মহানুভবতার কথা স্বীকার করে বলেছিলেন, ''সে অর্থ দিয়ে আমার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছিল যখন মানুষ আমাকে বঞ্চিত করেছিল।''[১] মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতি অর্থের সাহায্য তাঁর সহমর্মিতা ও সহানুভূতির একটি উদাহরণ, যখন তিনি দেখলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যায়দ ইবনে হারিসার প্রতি আকৃষ্ট ওই সময় তিনি তাঁর (খাদিজার) মালিকাধীন ছিলেন - তখন তাঁকে উপহার দিয়ে দিলেন। ফলস্বরূপ তিনি ইসলামের প্রতি যায়দের অগ্রগামিতার কারণ হলেন।[১]

শিআবে আবু তালিবে তিনি সহযোগিতা ও খাদ্য সরবরাহে অংশ নিয়েছিলেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, হাকিম ইবনে হিযাম একদিন বের হলেন। তাঁর সঙ্গে একজন লোক ছিলেন। তিনি কিছু খাবার তাঁর চাচি খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের নিকট নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় তিনি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর স্ত্রী। ওই সময় তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) শিআবে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর সঙ্গে আবু জাহলের দেখা। সে বলল, তুমি বানু হাশিমের নিকট খাবার নিয়ে যাচ্ছো ? আল্লাহ্র শপথ ! তুমি আর তোমার খাবার এই অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ না আমি তোমাকে কুরাইশের সামনে অপমানিত করি। আবুল বুখ্তারি বিন হাশিম বিন হারিস বিন আসাদ তাকে বললেন, তুমি তাঁকে তাঁর চাচির কাছে সেই খাবার পাঠাতে নিষেধ করছো যেটা তাঁর নিকট ছিল আর তার মালিক তাঁর চাচি ? কিন্তু আবু জাহল তাকে ছাড়তে অস্বীকার করল।[২]

১। মুসনাদে আহমাদ (আল্ ফাতহুর রাব্বানি ২০/২৪০), হায়সামি এর সনদটিকে হাসান বলেছেন, দেখুন : মাজ্মাউয যাওয়াইদ ৯/২২৭)।

১। ইবনে হাজার, আল্ ইসাবা ১২/২১৬।

২। আস্ সীরাহ্ ১৪০, ১৪২; গবেষণা মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ্ (প্রকাশনা আর্ রিবাত্ব)।

কোথা গেল চেতনা তোমার

মোহাঃ নুরুল ইসলাম মিয়া

পৃথিবীকে ভালোবেসে আরামের স্রোতে ভেসে
মরণের ভয় গেছ ভুলে।
জীবনের খেলা শেষে মৃত্যু যে কাছে এসে
জোর করে নিয়ে যাবে তুলে।।

ছোটো বড়ো কিছু নয় যার দিন শেষ হয়
মৃত্যুর চাকা যায় ঘুরে।
তবু মূর্খের মতো কেন তুমি ভেবে থাকো
শেষ দিন আছে বহু দূরে।।

একে একে পার হয়ে বহুদিন গেছে বয়ে
বৃদ্ধ হয়েছ তুমি তাই।
রক্তের তেজ খুয়ে শরীর পড়েছে নুয়ে
আজ তুমি বড়ো অসহায়।।

হাঁটিতেছ লাঠি ধরে বসিতেছ বারে বারে
সময় নাহি কো বুঝি আর।
ডুবিলে জীবন তরী করিবেনা আর দেরী
নিয়ে যাবে খাটে জানাজার।।

একটু একটু করে আয়ুখানি গেল ঝরে
কোথা ছিল চেতনা তোমার।
জীবনের দরজায় মৃত্যু যে ধাক্কায়
চলে গেলে ফিরিবে না আর।।

ওরে মন কত দিন রবি আর উদাসীন
যাবি নাকি তুই পরপারে।
দেখ্ না কাফন তোর ডাকে তোরে দিনভর
কবে তুই কাছে নিবি তারে।।

চলে যাবে এ জীবন হতে হবে সচেতন
সময় যে আসে শেষ হয়ে।
আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলো তার পথ ধরে
চাও ক্ষমা তুমি নত হয়ে।।

দিয়েছেন তিনি যাহা অগণিত সবই তাহা
শেষ নাই যাঁর করুণার।
জীবনের যত পাপ ধুয়ে মুছে হয় সাফ
সীমাহীন কৃপাতে তাঁহার।।

মাগফিরাত কামনা

সরল পথ গার্লস অ্যাকাডেমির (বেলডাঙ্গা) সম্পাদক জনাব আফসার আলী সাহেব গত ১২.০৯.২০১৭ দিবাগত রাত্রি ৯.৩০টার সময় ইন্তেকাল করেন। তিনি দক্ষতার সঙ্গে দীর্ঘ ৪বছর যাবৎ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি বড়ুয়া আহ্‌লে হাদীস শিক্ষা কেন্দ্রের সম্পাদকও ছিলেন এবং বেলডাঙ্গা যাকাত ফান্ডের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম একজন। আপনাদের সকলের কাছে বিনীত অনুরোধ তাঁর জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকটে মাগফিরাত কামনা করবেন। হে আল্লাহ্! তুমি তাঁকে জান্নাতবাসী কর —আমীন।

বিনীত
ইকবাল রশীদ (সভাপতি)
সরল পথ এডুকেশনাল এ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

জানা-অজানা

সংকলনে - মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান

১। প্রশ্ন : রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে কষ্টদানকারী প্রতিবেশীগণের নাম কী ?

উ:— চাচা আবু লাহাব ও তার স্ত্রী, হাকাম বিন আবুল আস বিন উমাইয়া, উক্বা বিন আবু মুআইত্ব, আদী বিন হামরা সাক্বাফী, ইবনুল আসদা আল হুযালী।

২। প্রশ্ন ঃ প্রতিবেশীদের মধ্যে কে ইসলাম কবুল করেছিলেন ?

উঃ— হাকাম বিন আবুল আস বিন উমাইয়া (ইবনু হিশাম ১/৪১৫-১৬)।

৩। প্রশ্ন ঃ প্রতিবেশীদের অত্যাচারে রসূল অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে আল্লাহ্ সান্ত্বনা দিয়ে কি বলেন ?

উঃ— তোমার পূর্বে বহু রসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে কিন্ত এ মিথ্যারোপে তারা ধৈর্যধারণ করেছেন এবং তারা নির্যাতিত হয়েছেন যতক্ষণ না তাদের কাছে আমাদের সাহায্য এসে পৌছেছে। আর আল্লাহ্র বাণীসমূহের পরিবর্তনকারী কেউ নেই। এ বিষয়ে নাবীগণের কিছু খবর তোমার নিকটে পৌছে গেছে (যার মধ্যে তোমার জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে (৬:৩৪)।

৪। প্রশ্ন ঃ কে কার নির্দেশে সাজদারত অবস্থায় রসূলের উপর উটের ভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল এবং কেন ?

উঃ— আবু জাহালের নির্দেশে ওক্বা বিন আবী মু'আইত্ব উটের ভুঁড়ি কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিল যাতে করে ভুঁড়ির চাপে ও দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান।

৫। প্রশ্ন ঃ এই বিপদ থেকে তিনি কীভাবে রক্ষা পান ?

উঃ— মা ফাতেমা খবর পেয়ে দৌড়ে এসে ভুঁড়িটি সরিয়ে দিয়ে রক্ষা করেন (বুখারী হাঃ ৫২০)।

৬। প্রশ্ন ঃ উক্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার পর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কি বলেছিলেন ?

উঃ— হে আল্লাহ্ তুমি কুরায়েশকে ধর (তিনবার) ! হে আল্লাহ্ তুমি আমর ইবনু হিশাম (আবু জাহল) কে ধর। হে আল্লাহ্ তুমি উৎবা ও শায়বাহ্ ও শায়বাহ্ বিন রাবীয়াহ্, অলীদ বিন উৎবা, উমাইয়া বিন খালাফ, ওক্বা বিন আবু মু'আইত এবং উমারাহ্ বিন অলীদকে ধর। ইবনু মাসউদ বলেন, আমি তাদের (উক্ত ৭ জনের) সবাইকে বদর যুদ্ধে নিহত হয়ে কুঁয়ায় নিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখেছি (বুখারী হা ৫২০, মুসলিম হাঃ ১৭৯৪)।

৭। প্রশ্ন ঃ এই ঘটনার দ্বারা কি বুঝা যায় ?

উঃ— নেক্কার ব্যক্তির দুআ বা বদ্ দুআ অবশ্যই আল্লাহ্র নিকটে কবুল হয়। তার বাস্তবায়ণ সঙ্গে সঙ্গে হতে পারে অথবা আল্লাহ্ তার থেকে অনুরূপ একটি কষ্ট দূর করে দেন অথবা সেটি আখেরাতে প্রদানের জন্য রেখে দেন (আহমাদ হা ১১১৪৯)।

৮। প্রশ্ন ঃ রসূলকে স্বলাতরত অবস্থায় গলায় কাপড় পেঁচিয়ে ধরে হত্যা করতে চেয়েছিল কে ?

উঃ— ওক্বা বিন আবু মু'আইত্ব।

৯। প্রশ্ন ঃ উক্ত বিপদ থেকে রসূল কীভাবে রক্ষা পান ?

উঃ— জনৈক ব্যক্তির চিৎকারে আবু বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছুটে এসে কাপড় খুলে দিলেন ও মদমায়েশগুলিকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করছ, যিনি বলেন আমার প্রভু আল্লাহ্। অথচ তিনি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ তোমাদের কাছে আগমন করেছেন (বুখারী হাঃ ৬৩৭৮, ৪৮৫)।

১০। প্রশ্ন ঃ এর ফল কি হয়েছিল ?

উঃ— এ সময় তারা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে ছেড়ে দিয়ে আবু বকরকে বেদম প্রহার করে (বুখারী হাঃ ৬৩৭৮, ৪৮১৫)।

১১। প্রশ্ন ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আসের নিকট রসূলের উপর সব চাইতে কষ্টদায়ক আচরণ কোনটি ?

উঃ— ওরওয়া বিন যুবায়ের বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করলাম মুশরিকরা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে সব চাইতে কষ্টদায়ক আচরণ কোন্টি করেছিল, আমাকে বলুন। তখন তিনি ওক্বা বিন আবু মু'আইত্বের অত্র ঘটনাটি বর্ণনা করেন (বুখারী হাঃ ৩৮৫৬)। অর্থাৎ গলায় কাপড় পেঁচিয়ে মেরে ফেলার অপচেষ্টা।

১২। প্রশ্ন ঃ আবু বাকরের উক্ত উক্তির সঙ্গে কোন নাবীর উপর গোপন ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তির উক্তির মিল আছে

উঃ— আবু বকরের উক্তির প্রায় দু হাজার বছর পূর্বে মূসা (আলাইহিস্ সালালম) এর উপর ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তির উক্তির মিল আছে।

পরবর্তী অংশ ৪৪ পাতায়

সওয়াল জওয়াব

সম্পাদনা পরিষদ

১। প্রশ্ন ঃ এক রাকাআত বিতরে তিনটি কুল (সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস) পড়তাম। কিন্তু সরল পথ পত্রিকাতে দেখা যায় যে হাদীসটি যঈফ। তাহলে এক রাকাআত বিতরে অন্য তিনটি সূরা পড়ব না? সহীহ্ দলীল দ্বারা আলোচনা জানতে চায় — আনওয়ারুল ইসলাম, মানিকচক, মালদা।

উত্তর ঃ যে কোনো স্বলাতে আল্ কুরআনের যে কোনো স্থান হতে অংশ বিশেষ বা একাধিক সূরা তিলাওয়াত করতে পারা যায়। এতে অসুবিধার কিছু নেই। কেননা আল্লাহ্ বলেন, ''তোমাদের যা সহজ হয় তা আল্ কুরআন হতে পড়'' (সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াত নং ২০)। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''অতঃপর তোমার স্মৃতিতে থাকা আল্ কুরআনের যা সহজ মনে হয় তা পড়'' (সহীহ্ আবী দাউদ ৮০২)। তবে উত্তম হল সুন্নাহ্র অনুসরণ করা। তিন রাকাআত বিতর হলে প্রথম রাকাআতে সূরাহ্ আ'লা, দ্বিতীয় রাকাআতে সূরাহ্ কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাআতে সূরা ইখলাস পড়াটা রসূলুল্লাহ্র সুন্নাহ্ (সুনানুর নাসায়ী ১৭০০, ১৭০১ ও ১৭০২)।

কেউ যদি শুধুমাত্র এক রাকাআত বিতর পড়ে তাহলে তার ইচ্ছামত সে কিরআত করবে। এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো সহীহ্ হাদীস আমার নজরে আসেনি। তিন কুল পড়া সুন্নান না ভেবে অনিয়মিতভাবে তা পড়তে কোনো সমস্যা নেই যেহেতু তিন কুল পড়ার হাদীস সহীহ্ নয়, কাজেই তা পড়া সুন্নাত ভেবে পড়া ঠিক নয়।

২। প্রশ্ন ঃ মুক্তাদীগণ কি ইমামের দুদিকে সালাম ফিরানোর পর সালাম ফিরাবে না একদিকে ফিরালেই ফিরাতে হবে। অনুগ্রহ করে সঠিকটি জানাবেন — মুহাম্মাদ আলমগীর, শেখপুর,সামশেরগঞ্জ।

উত্তর ঃ মুক্তাদীগণ ইমামের দুই দিকের সালাম সম্পূর্ণ হওয়ার পর সালাম ফিরাবে। কেননা ইমামের আগে কোনো কাজ করা যাবে না। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তোমরা ইমামের আগে রুকু, সাজদাহ ও সালাম ফিরানোর কাজ করবে না (হাদীস সহীহ্, নাসায়ী ১৩৬৯, সহীহ্ মুসলিম ৪২৬)।

উল্লেখ্য যে, দুই দিকে সালাম ফেরানোর আগে স্বলাতের সালাম ফিরানো সম্পূর্ণ হয় না এমন ফাতাওয়াই প্রদান করেছেন সউদী ফাতাওয়া কমিটি। শুধুমাত্র আলিমদের জন্য আরাবী ফাতাওয়াটি নকল করা হচ্ছে —

الجواب : ورد فى (السنن) عن النبى ﷺ أنه قال مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم (سنن الترمذى ٢٣٨) و الثابت من فعله ﷺ أنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه و عن يساره، فدل ذلك أن التسليمتين ركن من اركان الصلاة و لا يكون الامام مكملا للصلاة حتى يسلم التسليمة الثانية اذاً فتسليم المأموم بعد تسليم الامام الاولى تسليمٌ قبل كمال الصلاة فلايجوز للمأموم أن تسليم قبل تسليمة الامام الثانية .... فلا يحوز للمأموم ذلك

(ফাতাওয়া লাজনা দায়িমা ৫/৪০৭)।

৩। প্রশ্ন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস —

أن رجلا صلى خلف الصف وحده .... فامره رسول الله ﷺ أن يعيد الصلاة.

এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একাকী স্বলাত আদায় করতে দেখে তাকে পুনরায় স্বলাত আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন (হাদীস্ সহীহ্, তিরমিযী ২৩০)।

استقبل صلاتك فلاصلاة لفرد خلف الصف.

ঘুরিয়ে পড় তোমার স্বলাত কেননা কাতারের পেছনে কোনো একক ব্যক্তির স্বলাত হবে না (হাদীস সহীহ্, মুসনাদু আহমাদ ১৬২৯৭)।

উক্ত হাদীস দ্বয়ের আলোকে কাতারের পেছনে একাই স্বলাত আদায় করার বিধান কেমন? মনগড়া যুক্তি ছাড়া সহীহ্ দলীল দ্বারা উত্তর দিবেন—আবূ হিলাল।

উত্তর ঃ প্রশ্নকারী হাদীস দুটি বিনা হাওয়ালাতে উল্লেখ করেছেন। হাদীস দুটির অবস্থা সহ অর্থ প্রকাশ আমাদের।

আপনার প্রশ্ন করার আন্দাজ আপত্তিকর। সরল পথের এ বিষয়ে কোনো ফাতাওয়া আপনার বুঝার বিপক্ষে গেছে। সরল পথ ফাতাওয়া কমিটি এ বিষয়ে চরম সতর্ক, আল্ হামদুলিল্লাহ্। আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না যে ইচ্ছামত কোনো ফাতাওয়া দিয়েছে।

আপনি নিম্নের প্রশ্নগুলির প্রতি নজর দিন।

(ক) জামাআত ব্যতীত একাকী স্বলাত পড়া যায় কিনা?

(খ) কোনো ব্যক্তি মসজিদে পৌঁছে দেখল সমস্ত কাতার পূর্ণ তাতে সম্পৃক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এমন পরিস্থিতিতে সে ব্যক্তি কী করবে? সরাসরি হাদীস হতে উত্তর দিন।

(গ) যদি বলেন, অপেক্ষা করবে কোনো ব্যক্তির আসার, অন্যথা স্বলাত শেষে একাই পড়বে। এমন ফাতাওয়া অনেকেই দিয়েছেন, কিন্তু এর দলীল কী?

(ঘ) আল্লাহ্ বলেন, 'স্বলাত আদায়কারীর সাথে স্বলাত আদায় কর' (সূরা বাক্বারাহ্ ৪৩)। একক ব্যক্তি সাথী না পাওয়াই এই হুকুম পালনে বঞ্চিত হল।

(ঙ) কাউকে টেনে সাথী করে নেওয়ার হাদীস সহীহ্ নয়। দেখুন বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ, শুআইব আল্ আরনাউত ও তাঁর সাথীগণের গবেষণা সহ মুসনাদু আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ১৮০০০ নম্বর হাদীসের টীকা। শেষে তাঁরা লিখেছেন —

قـال السـنـدى : قوله : فأمره أن يعيد الصلاة، ظاهره أن مـن صـلـى كـذالك لا تـصـح صـلاتـه و بـه أخذ بـعـضهـم و الـجـمهـور عـلى أنهـا صحيحة، و الأمر بالاعادة اما للجزر أو هو منسوخ.

(মুসনাদু আহমাদ, ২৯ খণ্ড ৫২৬ পৃঃ, শুআইবের তাহ্কীক সহ)।

আমরা মনে করি, হাদীস হতে মাসআলা গ্রহণের বিষয়ে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র উক্তিটিকে সামনে রাখা বাঞ্ছনীয়। তিনি বলেন, 'যখন তোমাদের নিকট রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কোনো হাদীস বর্ণনা করা হবে তখন তা হতে সেই অর্থটি নেওয়ার চেষ্টা করবে যেটা হিদায়াতের, তাকওয়ার নিকটবর্তী এবং যে অর্থটি অন্যের তুলনায় উত্তম (দারিমী, হাদীস সহীহ্ ৬১২, মুসনাদু আহমাদ, শুআইব আরনাউতের তাহক্বীক সহ ১৯৮৫)।

আমরা মনে করি সামনের কাতারে প্রবেশের সম্ভাবনা অথবা খালি থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি যদি কারও প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা বা অন্য কোনো ব্যক্তিগত কারণে ইচ্ছাকৃত তাতে না দাঁড়ায়, তার জন্য রসূলুল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা। জামাআতে অংশ গ্রহণ যেহেতু বাধ্যতামূলক সেজন্য কেউ না থাকলে একাই পেছনে দাঁড়িয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্ তার স্বলাত হয়ে যাবে। যেমন উম্মু সালিমাহ্ রাতের স্বলাতে একাই রসূলুল্লাহ্‌র পেছনে ইক্তিদাহ করেছেন। আনাস ও অপর একটি শিশু ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পেছনে (মুসনাদুল বায্যার ৬৪৪৫)।

বিখ্যাত সউদী আলিম আল্লামা স্ব-লিহ আল্ উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর কিতাব মাজমূউ ফাতাওয়া লিল উসাইমীন ১৫ খণ্ড ১৮৭ পৃষ্ঠায় বলেন, এ বিষয়ে মত পার্থক্য থাকলেও বিনা ওযরে একাকীর স্বলাতকে মাকরূহ মনে করেন - ইমাম মালিক, শাফিঈ ও ইমাম আবূ হানীফাহ্। আর যদি ওযর থাকে যেমন সামনের সারিতে স্থান নেই এবং সঙ্গ দেওয়ার কেউ নেই এমতাবস্থায় তার স্বলাত শুদ্ধ হবে। তাঁদের দলীল মুসনাদুল বায্যারে বর্ণিত আনাসের হাদীস —

قـالـوا : ان الرجل و النساء سواء فى الاحكام الشرعية بـأن الـنـبـى ﷺ لـم يـأمر أبا بكرة حين ركع قبل أن يـدخـل الـصف ان يـعيد الصلاة و بان النبى ﷺ ادار ابـن عباس من ورائه اثـناء الصلاة، فاذا جاز أن يكون الا نـفـراد فى جزء الصلاة جاز أن يكون جميعا، اذ لو كـان مبـطـلا لـلصلاة لم يكن بين قليله و كثيره فرق كالوقوف قدام الامام.

و أجـابـوا عن الاحاديث النافية لصلاة المنفرد خلف الـصف بـان الـمـراد بها نفى الكمال فهى كقوله ﷺ (لا صلاة بحضرة طعام)

(মাজমূ ফাতাওয়া লিল উসাইমীন ১৫/১৮৭)।

আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

৪। প্রশ্ন ঃ ছুটে যাওয়া স্বলাত আদায় করার নিয়ম কী এবং জামাআত সহকারে মেয়েদের স্বলাত আদায় করার বিধান কী? — মমতাজ খাতুন।

উত্তর ঃ স্বলাত ছুটে যাওয়ার কারণ একাধিক হতে পারে। যেমন ভুলে যাওয়া, ঘুমিয়ে যাওয়া অথবা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। বলা বাহুল্য ইচ্ছাকৃত স্বলাতের সময় অতিক্রান্ত করা ও স্বলাত তার সময়ে আদা না করা কাবীরা গুনাহ্। এমতাবস্থায় ব্যক্তির উপর কুফরের ফাতাওয়া তার নিয়্যাত অনুযায়ী বিল্দ্ধ হতে পারে।

ভুলে গেলে অথবা ঘুমিয়ে উঠতে না পারলে যখনই স্মরণ হবে অথবা ঘুম ভাঙবে তখনই পড়তে হবে। মহান আল্লাহ্‌র রসূল বলেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি ভুলে যায় তাহলে স্মরণ আসা মাত্রই আদায় করবে, এছাড়া তার কোনো পরিপূরক নেই' (সহীহুল বুখারী ৫৯৭)। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহ আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তিন ব্যক্তির জন্য (তার আমল রেকর্ডের কলম) দাঁড়ানো থাকে .... তারমধ্যে ঘুমিয়ে যাওয়া ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জেগে যায় (আবূ দাউদ ৪৪০১, ফিকহুল হাদীস ১ম খণ্ড ৫২১ পৃঃ)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

ليس فى النوم تفريط ، انما التفريط فى اليقظة فاذا نسى احدكم صلاة اونام عنها فليصلها اذا ذكرها.

ঘুমে সীমালংঘন নয়। সীমালংঘন তো জাগ্রতাবস্থায় (জেনে বুঝে হয়)। তোমাদের কেউ যদি কোনো স্বলাত ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে স্মরণ আসা মাত্র আদায় করে নিবে (সহীহ্ ইবনু মাজাহ্ ৫৯৮, সহীহ্ মুসলিম ৬৮১)।

একাধিক স্বলাত ছুটে থাকলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক। সিরিয়াল ব্রেক করা যাবে না। খন্দকের যুদ্ধে আল্লাহ্‌র রসূলের একাধিক ছুটে যাওয়া স্বলাতকে তিনি ধারাবাহিক ভাবেই সাহাবীদের নিয়ে পড়েছেন (সহীহ্, নাসায়ী ৬৬১)।

স্বলাত আদায়ের বিষয়ে নারী ও পুরুষের কোনো পার্থক্য আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হতে বর্ণিত হয়নি। বরং সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হাদীস ''জামাআতের স্বলাত একাকী স্বলাতের চাইতে মর্যাদাতে ২৭ গুণ বেশি'' (সহীহুল বুখারী ৬৪৫)। নারী ও পুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য। পার্থক্য এতটুকুই যে কোনো নারী কোনো পুরুষের ইমামতি করতে পারবে না। শরীআতে এ বিষয়ে কোনা প্রমাণ নেই। তার অনেক কারণের মধ্যে অবশ্যই পর্দা, এতে কোনো সন্দেহ নেই। মহিলাগণ মসজিদে গিয়ে জামাআত সহকারে পুরুষদের পেছনে স্বলাত আদায় করতে পারে। আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাদের মসজিদে যেতে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন (সহীহ্ আবূ দাউদ ৫২৯, সহীহুল বুখারী ৪৬৫)। তবে তাদের বাড়িতে স্বলাত আদায় করা উত্তম (প্রাগুক্ত সহীহ্ আবূ দাউদ)।

মহিলাগণ জামাআত সহকারে স্বলাত আদায় করলে তাদের মহিলা ইমাম লাইনের মাঝে দাঁড়াবে, পুরুষের মত আগে নয় (দারাকুতনী ১/৪০৪, ১/৪০৫, সহীহ্ আবূ দাউদ ৫৫৩)। একমাত্র দুই ঈদ ও জুমুআতে মহিলাদের পৃথক কোনো জামাআত নেই।

৫। প্রশ্ন ঃ ভাড়া নেওয়া জমির উপর উশর দিতে হবে কি? মহিব্বুল আনসারী।

উত্তর ঃ সর্বপ্রকারে জমির উৎপন্ন ফসলের উশর প্রদান করা ফরয। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''(ফসলের) যাকাত তার ফসল কাটার দিনে প্রদান করো'' (সূরাতুল্ আনআম ১৪১)।

জমির মলিকানা স্থায়ী ও অস্থায়ী হয়। ভাড়া জমির আপনি যতদিন মালিক থাকবেন উশর বা যাকাত দিতেই হবে। তবে ধান, যব, গম, ডাল জাতীয় শষ্য এবং তৈলজাত শষ্যের উৎপাদন ১৮.৭৫ মনের নীচের হলে লাগবে না (সহীহুল বুখারী ১৪৪৭)।

এমনকী ভাগ চাষ করলেও তাতে প্রাপ্ত ফসল যদি ১৮.৭৫ হয় অথবা তারও বেশি হয় তাহলে তার এক দশমাংস উশর হিসাবে প্রদান করতে হবে। মতভেদ থাকলেও এটাই দলীলের ভিত্তিতে সঠিকের নিকটবর্তী।

৬। প্রশ্ন ঃ মাইয়িতকে কবরে রাখার সুন্নাতী পদ্ধতি উল্লেখ করে বাধিত করবেন। - ৯০৮৩৮২৮৮৪৭

উত্তর ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু য়াযীদ জনৈক মৃত ব্যক্তিকে পায়ের দিক দিয়ে কবরে নামালেন এবং বললেন, 'এটাই সুন্নাহ্' (সহীহ্ আবূ দাউদ ২৭৫০)। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রথমে মাথা প্রবেশ করানো হয়েছিল (অর্থাৎ পায়ের দিক হতে) (মুসনাদু শাফিঈ ১/২১৫, ফিকহুল হাদীস ৬৪৫ পৃঃ)।

এর থেকে কবরে নামানোর যে পদ্ধতি প্রমাণিত তা হল — কবরের পায়ের দিক অর্থাৎ দক্ষিণ দিক থেকে মাইয়্যেতকে লম্বালম্বিভাবে মাথা আগে কবরে নামাতে হবে।

মাইয়্যিতকে সম্পূর্ণ ডান পার্শ্বদেশে শোয়াতে হবে এবং কিবলাহ্মুখী করতে হবে। এটাই সুন্নাহ্ হওয়াতে বিশেষজ্ঞ আলিমদের দ্বিমত নেই (বিস্তারিত তথ্য দ্রষ্টব্য আহকামুল জানাযিয্ লিল আলবানী ১৯২ পৃঃ, আস্ সাইলুল জার্রার ১ম খণ্ড /৩৬২, ফিকহুল হাদীস ১/৬৪৫ পৃঃ)।

সংগঠন সংবাদ

অদ্য ১০.৯.২০১৭ রোজ রবিবার উমরপুর হাটতলা জামে মসজিদের দোতলায় জমঈয়তের আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদের পক্ষ হতে একটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলার আমীর আব্দুল্লাহ্ সালাফী সাহেব তাঁর দারসে কুরআনে সূরাহ্ আনফালের ২৬-৩৩ নং আয়াতগুলো বিশ্লেষণে বলেন, ‘‘আল্লাহ্ আমাদের সেই দিনের কথা স্মরণ করতে বলেন, যখন পৃথিবীতে মুসলিমরা সংখ্যায় ছিল স্বল্প ও শক্তিতে ছিল দুর্বল। তখন তারা আশংকা করত লোকেরা তাদেরকে অপরহণ করবে। অতঃপর আল্লাহ্‌ই তাদেরকে আশ্রয় এবং উত্তম বস্তুসমূহ দান করেন। আল্লাহ্ আমাদের স্মরণ করতে বলেন যে, আমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান সন্ততি তো পরীক্ষার বস্তু। আল্লাহ্ বিশ্বাসী বান্দাদের লক্ষ্য করে বলেন, যদি আল্লাহ্‌র বিশ্বাসী বান্দারা আল্লাহ্‌কে প্রকৃত ভয় করে বা তাকওয়া অর্জন করে তাহলে আল্লাহ্ তাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন, পাপ ক্ষমা করবেন। কাফেররা যখন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তাকে বন্দি, হত্যা অথবা নির্বাসিত করার জন্য। আল্লাহ্ বলেন তারা কি ষড়যন্ত্র করে? আল্লাহ্‌ও তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। আর ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ। কাফেরদের কুরআন পড়ে শোনালে তারা কুরআনকে পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া কিছুই মনে করত না এবং তারা বলতো যে, তারা যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তাদের উপর কেন আকাশ হতে পাথর বর্ষণ হয় না, কেন তাদের উপর শাস্তি নিপতিত হয় না? কিন্তু আল্লাহ্ বলেন, তাদের নিকট রসূল থাকা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। তাই আমাদের সাংগাঠনিক ভাবে মানুষকে বোঝাতে হবে, আমাদের আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাঁচতে অত্যাধিক হারে ইসতেগফার করতে হবে। ইসতেগফারের দুআ হবে —

“لا اله الا انت سبحٰنك انى كنت من الظّٰلمين”

বিভিন্ন মোকামিতে দাওয়াতী প্রচারে এ ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে। আগামী কয়েক মাস জুমআর খুতবায় জনসাধারণকে সূরাহ্ আনফালের উক্ত বক্তব্য শোনাতে হবে। অতএব আসুন আমরা সূরাহ্ আনফালের বক্তব্য অনুধাবন করার চেষ্টা করি এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তি থেকে বাঁচতে অধিকহারে ইসতেগফারে আত্মনিয়োগ করি।

অতঃপর সভার এজেণ্ডা, বিষয়ে আলোচনা শুরু হয় ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীসের রাজ্য সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল ২৬শে অক্টোবর ২০১৭, আপাতত তা স্থগিত থাকছে এবং তা আগামী বছর অর্থাৎ ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

আর কোনো আলোচনা না থাকায় দুআ পাঠের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সভার সমাপ্তি ঘটে। ইতি —

জেলা সম্পাদক

---

৪৪ পাতার পর

১৩। প্রশ্ন ঃ উক্তি উক্তিটি কি?

উঃ— ফেরাউন গোত্রের জনৈক মুমিন ব্যক্তি যে তার ঈমান গোপন রাখত লোকেদের বলল, তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করবে, যিনি বলেন আমার পালনকর্তা আল্লাহ্ এবং তিনি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ তোমাদের কাছে আগমন করেছেন (৪০:২৮)।

১৪। প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে পশ্চাতে নিন্দা করতেন ও সামনে গিয়ে যাচ্ছে তাই বলে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করতেন?

উঃ— উমাইয়া বিন খালাফ।

১৫। প্রশ্ন ঃ সম্মুখে ও পশ্চাতে নিন্দাকারীর প্রসঙ্গে কোন সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।

উঃ— সূরা হুমাযাহ্ ‘দুর্ভোগ প্রত্যেক সম্মুখে ও পশ্চাতে নিন্দাকারীর জন্য’ (সূরা হুমাযাহ্ ১০৪:১)।

১৬। প্রশ্ন ঃ কে কার নির্দেশে রসূলের মুখে থুতু নিক্ষেপ করে?

উঃ— উবাই বিন খালাফের নির্দেশে ওক্ববা বিন আবু মু'আইত্ব রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মুখে থুতু নিক্ষেপ করে।

১৭। প্রশ্ন ঃ থুতু নিক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ আয়াত অবতীর্ণ হয়?

উঃ— সূরা ফুরক্বানের ২৭-২৯ নম্বর আয়াত।

বহরমপুর কেন্দ্রিক স্থায়ী সময় সারণী (১৬ই অক্টোবর — ১৫ই নভেম্বর)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যুহর	আসর	মাগরিব	এশা
১৬ অক্টোঃ	৪:২০	৫:৩৫	১১:২৩	২:৪২	৫:১০	৬:২৬
১৭	৪:২১	৫:৩৫	১১:২৩	২:৪১	৫:০৯	৬:২৫
১৮	৪:২১	৫:৩৬	১১:২৩	২:৪১	৫:০৮	৬:২৪
১৯	৪:২২	৫:৩৬	১১:২২	২:৪০	৫:০৮	৬:২৩
২০	৪:২২	৫:৩৬	১১:২২	২:৪০	৫:০৭	৬:২৩
২১	৪:২২	৫:৩৭	১১:২২	২:৩৯	৫:০৬	৬:২২
২২	৪:২২	৫:৩৭	১১:২২	২:৩৯	৫:০৬	৬:২২
২৩	৪:২৩	৫:৩৭	১১:২২	২:৩৯	৫:০৫	৬:২১
২৪	৪:২৪	৫:৩৮	১১:২২	২:৩৮	৫:০৪	৬:২০
২৫	৪:২৪	৫:৩৯	১১:২২	২:৩৭	৫:০৩	৬:১৯
২৬ ‘	৪:২৫	৫:৪০	১১:২১	২:৩৭	৫:০২	৬:১৮
২৭	৪:২৫	৫:৪০	১১:২১	২:৩৬	৫:০১	৬:১৮
২৮	৪:২৫	৫:৪১	১১:২১	২:৩৬	৫:০১	৬:১৭
২৯	৪:২৬	৫:৪১	১১:২১	২:৩৫	৫:০০	৬:১৭
৩০	৪:২৬	৫:৪২	১১:২১	২:৩৫	৪:৫৯	৬:১৬
৩১	৪:২৭	৫:৪২	১১:২১	২:৩৪	৪:৫৯	৬:১৫
১ নভেঃ	৪:২৭	৫:৪৩	১১:২১	২:৩৪	৪:৫৮	৬:১৫
২	৪:২৮	৫:৪৩	১১:২১	২:৩৩	৪:৫৭	৬:১৪
৩	৪:২৮	৫:৪৪	১১:২১	২:৩৩	৪:৫৭	৬:১৪
৪	৪:২৯	৫:৪৫	১১:২১	২:৩৩	৪:৫৬	৬:১৩
৫	৪:২৯	৫:৪৫	১১:২১	২:৩২	৪:৫৬	৬:১৩
৬	৪:২৯	৫:৪৫	১১:২১	২:৩২	৪:৫৬	৬:১৩
৭	৪:৩০	৫:৪৬	১১:২১	২:৩২	৪:৫৫	৬:১২
৮	৪:৩১	৫:৪৭	১১:২১	২:৩১	৪:৫৪	৬:১২
৯	৪:৩১	৫:৪৮	১১:২১	২:৩১	৪:৫৪	৬:১১
১০	৪:৩২	৫:৪৮	১১:২১	২:৩১	৪:৫৩	৬:১১
১১	৪:৩২	৫:৪৯	১১:২২	২:৩০	৪:৫৩	৬:১১
১২	৪:৩৩	৫:৫০	১১:২২	২:৩০	৪:৫২	৬:১০
১৩	৪:৩৪	৫:৫০	১১:২২	২:৩০	৪:৫২	৬:১০
১৪	৪:৩৪	৫:৫১	১১:২২	২:৩০	৪:৫২	৬:১০
১৫	৪:৩৫	৫:৫২	১১:২২	২:২৯	৪:৫১	৬:১০

মাসিক "সরল পথ" ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা • মুহাররম- ১৪৩৮ • অক্টোবর - ২০১৭
Reg. No. NRI No. WB BEN/2012/45211 Posting Registration : WB/MSD-056/2016-18

সরল পথ অ্যাকাডেমি (বয়েজ)

পরিচালনায় ঃ সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

স্থাপিত ঃ ২০১৩ ☆ গভঃ রেজিঃ নং - ৫৭৫৭ / ২০১৩

প্রবেশিকা ও মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার তথ্য ও ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ২০১৮

সম্মানীয় সুধীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম. আপনারা অবগত আছেন — 'সরল পথ অ্যাকাডেমি' ইসলামিক আদলে গড়া একটি অত্যাধুনিক স্বশিক্ষন আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিগত কয়েক বছর ধরে জাতির সেবায় নিয়োজিত। ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার কেন্দ্র

যোগাযোগ ৯৫৯৩৮৩৪৪২০ * ৯১৫৩২৩৫৮১৩ * ৮৭৫৯৩২৭৯৫৯ * ৯০৯৩২৮৭২৪৬

মূল্য - ১৮/- টাকা মাত্র Printed by : S.F.Printers, Beldanga, 9434 531 957